দাম : ৬০ টাকা

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা ঃ ১৪১৯

২২ অক্টোবর - ২০১২

সূচীপত্র

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা ঃ ১৪১৯, (যুগাব্দ : ৫১১৪)
৬৫ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ২২ অক্টোবর, ২০১২
৫ কার্তিক, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

■ দেবী প্রসঙ্গ ■

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী ■ ভিক্ষুদেব ভট্ট - ১৫

■ উপন্যাস ■

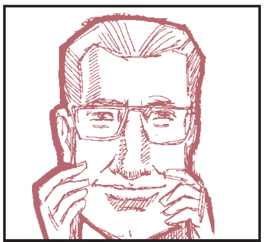

মুখের আড়ালে মুখ
সুমিত্রা ঘোষ : ৬৮

হানাদার ঘুণপোকা বনাম
এক রাজকুমার
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় : ২৬৯

অতলান্ত
সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত : ১৪১

■ প্রবন্ধ ■

ভারতবর্ষ বনাম ইণ্ডিয়া ■ অমলেশ মিশ্র - ১৯
বাঙালি হিন্দুর মূল্যবোধ ■ তথাগত রায় - ২৯
আজকের লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি নয় ■ ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী - ৩৩
বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞান দর্শন ও জাতীয়তাবাদ ■ অচিন্ত্য বিশ্বাস - ৪৭
শ্রীগুরুজী নির্ধারিত 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ' এবং পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিকরা ■ এস গুরুমূর্তি - ৪৯
রাষ্ট্রের পুনর্গঠন ও মানব সম্পদ বিকাশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকা ■ সত্যনারায়ণ মজুমদার - ৫৫
আন্দামান দর্শন ■ ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ - ১১৫
গাণিতিক বিস্ময় শ্রীনিবাস রামানুজন ■ দেবীপ্রসাদ রায় - ১৩১
রাষ্ট্র পরিচালনায় খড়ের মানুষের উপদ্রব ■ ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় - ১৩৬
সুভাষচন্দ্রের জীবনে দেবী দুর্গা ■ সন্দীপ কুমার দাঁ - ১৯৫
তিলকের প্রথম কারাবাস, শিবাজী উৎসব ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ■ ডাঃ গুরুপদ শাণ্ডিল্য - ২০৭
দেশে দেশে ডাকঘর ■ বিকাশ ভট্টাচার্য - ২৩১
মধেরার সূর্য মন্দির ■ সৌমেন নিয়োগী - ২৪৩
রহস্যময় গঙ্গারিডি সভ্যতা ■ সমিত দে - ২৯১
বাঙালিবাবুর বৈঠকখানা ■ অর্ণব নাগ - ২৯৯
ভারতীয় চিন্তাধারায় বৃহৎ সংখ্যা ■ প্রদীপ মজুমদার - ৩১৭

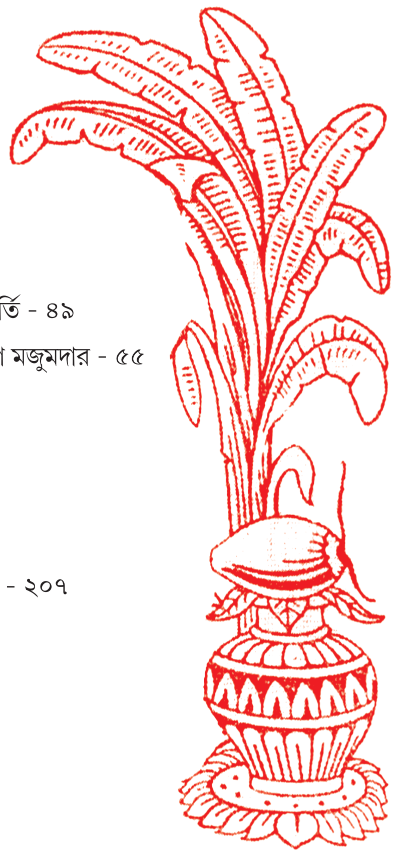

■ গল্প ■

জবাব ■ শেখর বসু - ৪১
অলৌকিক ঘরের সন্ধানে ■ দীপঙ্কর দাস - ১০৭
এক নায়িকার কথা ■ রমানাথ রায় - ১৮৩
লকেট ■ জিষ্ণু বসু - ১৯১
জ্বলন্ত মানুষ ■ গোপাল চক্রবর্তী - ২৩৭
ভাঙন ■ গোপালকৃষ্ণ রায় - ২৫৯
মধুক্ষরণ ■ রত্না ভট্টাচার্য - ২৯৫

■ রম্যরচনা ■

ধামালি ■ চণ্ডী লাহিড়ী - ২১৭
ডি-লা-গ্র্যান্ডি দাদাগিরি ইয়াক্ ইয়াক্ ■ পিনাকপাণি ঘোষ - ২৪৭

■ ভ্রমণ ■

সিন্ধু দর্শনে ■ বিজয় আঢ্য - ২২১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ : সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়
রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

প্রচ্ছদ চিত্রের পরিচিতি—

প্রচ্ছদে চিত্রিত মহিষমর্দিণী মূর্তিটি রচিত হয়েছে একটি প্রাচীন মূর্তি অবলম্বনে। মূর্তিটি বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। এটি ওড়িশা থেকে প্রাপ্ত। ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্যের একটি সুন্দর নিদর্শন। মূর্তিটি সম্ভবত দ্বাদশ খৃস্টাব্দে তৈরি। অষ্টম থেকে দ্বাদশ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত পাল যুগে প্রচুর দেবদেবীর মূর্তি তৈরি হয় ও ভারতীয় ভাস্কর্যে ত্রিমাত্রিকতা এই সময়েই ভালোভাবে রচিত হয়। চিত্রটিতে কল্পনা করে কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পোষাক ও রং সংযোজিত করা হয়েছে। কারণ, মূল মূর্তিটিতে সেই অংশগুলি ভগ্ন বা কোনও অংশ সম্পূর্ণ উৎপাটিত। কালাপাহাড়-এর হিন্দু মূর্তি ধ্বংসের প্রকোপ এই মূর্তিটিতেও পড়েছিল। প্রচ্ছদের প্রয়োজনে রং সংযোজিত করা হয়েছে, কারণ মূল মূর্তিটি কালো পাথর কেটে তৈরি। তবে রঙের ব্যবহারে কোনও তথ্য বিকৃতি নেই। পাল যুগের চিত্রকলায় এইসব রঙেরই ব্যবহার হোত। মূল মূর্তিটিতে দেবীর নাভিমূল থেকে হাঁটুপর্যন্ত বস্ত্র দ্বারা আবৃত ও দেহের উর্ধাংশ অনাবৃত। এখনও ওড়িশার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আদিবাসী রমণীদের মধ্যে এইরকম পোশাক দেখা যায়। প্রচ্ছদ চিত্রে দেবীর বস্ত্র সংযোজিত হয়েছে।

৬৫ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ৫ কার্তিক, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৪, ২২ অক্টোবর - ২০১২

দাম : ৬০ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

নারীর প্রথম পছন্দ..

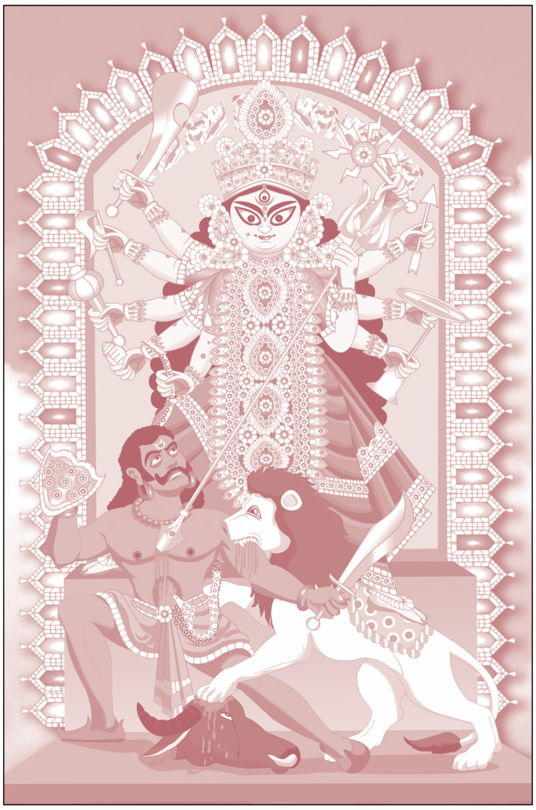

A Complete range in Cotton Saree

Mala™
SAREES

Shree Balaji (Mala) Textiles Pvt. Ltd.

180, MAHATMA GANDHI ROAD, 2nd. FLOOR, KOLKATA - 700 007

Phone : (033) 3240-9958, 2270-8197/98

দেবি ! প্রপন্নার্ত্তিহরে ! প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলস্য ।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি ! পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি ! চরাচরস্য ।। ৩ ।।

(শ্রীশ্রী চণ্ডী, ১১শ অধ্যায়)

— হে দেবি, তুমি প্রসন্না হও, যে তোমার শরণ লয় তুমি তাহার দুঃখ দূর কর; তুমি সারা জগতের মা, চরাচর বিশ্বের তুমিই অধীশ্বরী, তুমি প্রসন্না হইয়া বিশ্বকে রক্ষা কর।। ৩।

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী

ভিক্ষুদেব ভট্ট

বাঙালীর সংসার-প্রীতি এক বিশাল পারিবারিক ধারণার ফলিত রূপ। আজকালকার ফ্ল্যাট কালচারে বাঙালীর পরিবার 'দুজনে-কূজনে' পরিবার নিয়ন্ত্রণের সুখী-পরিবারের মধ্যে পুরাতন পরিবার ধারণা কতদিন বজায় থাকবে জানি না। তবে এটুকু হলফ করে বলা যায়, বাঙালীর দুর্গাপ্রীতি যতদিন থাকবে ততদিন মাভৈঃ। দেবতাকে ঘরের আঙিনায় এনে এমন করে সম্পর্ক পাতান পৃথিবীর আর কোথাও তো নাই। ঘরের মেয়ে ঘরে আসে, সঙ্গে ছেলেমেয়ে, তাদের সখের বিচিত্র বাহন। সকলেই এক সঙ্গে, এক সংসারের। এক প্রখ্যাত সাধু, ভাগবত ব্যাখ্যাকার মহাভক্ত, প্রচার বিমুখ ব্রহ্মলীন রামসুখদাস মহারাজ দেবী দুর্গা প্রসঙ্গে বলেছেন, পরিবারের মধ্যে বিচিত্র সমাবেশে--- মা ষড়ৈশ্বর্যময়ী, রাজ-রাজেন্দ্রাণী জগদ্ধাত্রী অপরূপ রত্নময়ী, অফুরন্ত অন্নের দাত্রী আর বাবা হলেন শ্মশানবাসী, পশুচর্মাবৃত, মহাযোগী ভোলা মহেশ্বর। মায়ের বাহন সিংহ, বাবার বাহন বৃষ--- খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক। লক্ষ্মীর বাহন পেচকের খাদ্য গণেশের বাহন ইঁদুর। কার্তিকের ময়ূরের প্রিয় খাদ্য সর্প। বহুজনের বহু মতের সমাবেশকে একত্রিত করে জনগণের গণপতিদের যে সংসার তাতে বিশ্বমায়ের ছড়ান আঁচলখানির ব্যাপ্তি আমরা অনুমান করতে পারি।

দুর্গম নামে অসুরকে বধ করেই মায়ের নাম দুর্গা। তিনি দুর্গতিনাশিনী। অসুরের কাজ জীবকে দুর্গতি প্রদান করা। আর জীবজগতের দুর্গতি থেকে মুক্ত করেন মা দুর্গা। দুর্গম স্বার্থান্ধতা এবং দুর্গম অবিদ্যার অধীন হয়ে জীব মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হলে মা তাঁর সন্তানদের রক্ষা করতে জ্ঞান-অসি হাতে তুলে নেন। গীতার শ্রীকৃষ্ণের মতো মা দুর্গাও শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলেছেন—

''ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।। ১১/৫৫

এই প্রকারে যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাববশত বিঘ্ন উপস্থিত হবে তখনই আমি আবির্ভূতা হয়ে অসুরগণক সম্যকরূপে বিনাশ করব, শত্রুদের নিঃশেষ করব।

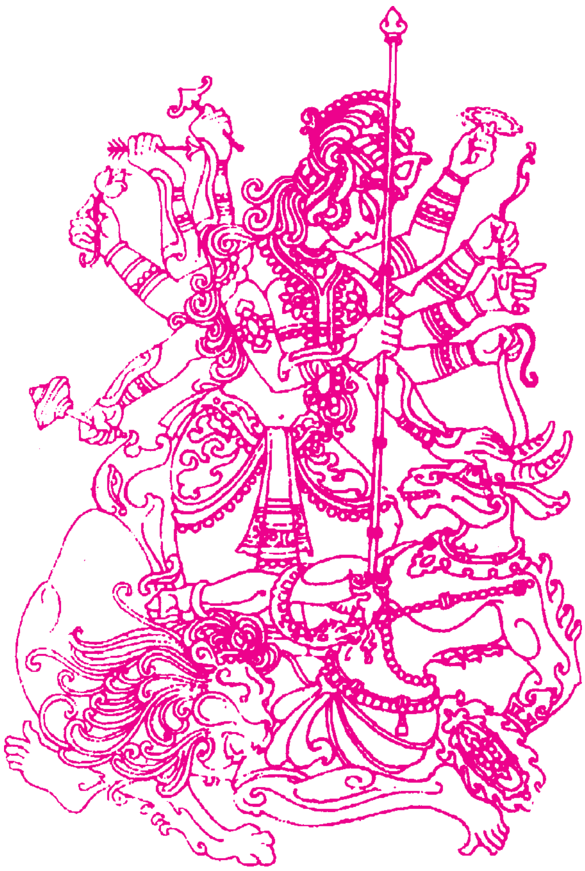

সন্তানদের জন্য মা সর্বদাই যুদ্ধরতা। অসংখ্য সন্তানদের রক্ষা করতে অসংখ্য হাতে অসংখ্য রূপে তিনি আবির্ভূতা হন। প্রতীক রূপে দশ হাতে দশপ্রহরণ ধারণী। বাম হাতে পাঁচটি অস্ত্র উপর থেকে নীচের দিকে খেটক (ঢাল), ধনু, পাশ, অংকুশ, ঘন্টা বা কুঠার। ডান হাতে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, বাণ ও শক্তি। ইনি মহাশক্তি, আবার সর্বশক্তি প্রদায়িনী।

মৃকণ্ডু ঋষির পুত্র মার্কণ্ডেয়-কথিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১-৯৩তম অধ্যায়কেই দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডী বলে। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে মোট ৭০০ শ্লোক বলে এর আর এক নাম সপ্তশতী। শ্রীশ্রী চণ্ডীর কাহিনী হল রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি আত্মীয়-স্বজন এবং রাজকর্মচারীদের দ্বারা লাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত এবং নির্বাসিত হয়ে উভয়েই বনে এসেছেন। সেখানে মেধা মুনির

আশ্রমে উপস্থিত হয়ে দু'জনেই দেখলেন, আত্মজনদের প্রতি মোহ তাঁদের কাটেনি। লাঞ্ছনাকারী স্বজন এবং সাংসারিক বিবিধ বিষয়ে তাঁদের উৎকণ্ঠার শেষ নেই। সব ছেড়ে বনে এসেও শান্তি নেই। তাঁরা তখন তপস্বী মেধা ঋষির নিকট এই মোহের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ঋষি বলেন, এ সকল মহামায়ার মায়া। মহাশক্তির কৃপা হলে এ সমস্যা দূর হবে। এই বলে বিভিন্ন সময়ে মহামায়ার বিভিন্ন লীলার কাহিনী শোনালেন। অসুর শক্তি বিনাশের জন্য প্রেরিত করলেন বিষ্ণুকে। বিষ্ণুকে দিয়ে করালেন।

মধু-কৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ, চণ্ড-মুক্ত, রক্তবীজাদিকে দেবী চণ্ডিকা স্বয়ং বধ করলেন। মেধা ঋষি দেবী কর্তৃক বহু অসুরবধের কাহিনী শোনালেন। অবশেষে তিন বৎসর সংযতচিত্তে দেবীর আরাধনার মাধ্যমে রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি দেবীকে সন্তুষ্ট করার ফলে জগদম্বা চণ্ডিকার আশীর্বাদ লাভ করলেন। আশীর্বাদ পেয়ে রাজা সুরথ নিজের শক্তিপ্রভাবে শত্রুদের ধ্বংস করে রাজ্য উদ্ধার করলেন। 'অত্র চৈবং নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ'। আর সমাধি তাঁর প্রার্থনা মতো পেলেন 'সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্' সংসার আসক্তি নাশক 'জ্ঞানম্' অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান।

তাই এই জগদ্ধাত্রী, জগন্মাতার বন্দনার কথা আমরা পাই সেই বৈদিক কাল থেকে। শ্রীশ্রী চণ্ডীতেই স্থান পেয়েছে রাত্রিসূক্ত (ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১০ম অনুবাক, ১২৭ সূক্ত) এই মন্ত্রে প্রার্থনা করা হচ্ছে— সা নো অদ্য যস্যা বরং নিতে যামন্ন্যবিক্ষ্মহি। বৃক্ষেণ বসতিং বয়ঃ।। এক্ষণে সেই দেবী ভুবনেশ্বরী আমাদের প্রতি প্রসন্না হোন। তাঁর প্রসাদে পক্ষীগণ যেমন বৃক্ষে নীড়াশ্রয়ে সুখে রাত্রিবাস করে, তদ্রূপ আমরা সুখে স্ব-স্বরূপে আমাদের স্থিতিলাভ করতে পারি।

আমাদের দেশে শাক্তধারা এবং বৈদিক ধারা সুদূর অতীত কাল থেকে কখনও হাত ধরাধারি করে কখনও বা বিচ্ছিন্ন হয়ে হিমালয়-কৈলাস থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিষ্ণুক্রান্তা, রথক্রান্তা এবং অশ্বক্রান্তা বা গজক্রান্তা অঞ্চল প্লাবিত করেছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে স্থান পেয়েছে দেবীসূক্ত (ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১০ম অনুবাক, ১২৫ সূক্ত) বৈদিক অম্ভূণ মহর্ষির কন্যা বাক্ নাম্নী ঋষি ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করে বলেছেন—

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্বরাম্যহমাদিতৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।...

অহং রাষ্ট্র সংগমনী বসূনাং চিকীতুষী প্রথমা যাজ্ঞয়ানাম্।।

আমি একাদশ রুদ্র, বসু, আদিত্য এবং সর্বদেব রূপে আমিই তো সর্বত্র বিচরণ করি। দেবশত্রুহন্ত্রী এবং সকলেরই ধারিয়িত্রী ও নিরন্ত্রী, আমিই রাষ্ট্রশক্তি। আবার চণ্ডিকাদেবী স্বয়ং বলছেন— একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। (১০/৫) একা আমিই এই জগতে বিরাজিতা। আমি ছাড়া আর দ্বিতীয়া কে আছে?

রাজযোগে (৯/৪) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিহা।

এই মহামায়া, মহাশক্তি ঋগ্বেদের মন্ত্রে প্রাণদায়িনী, অন্নদায়িনী, স্তন্যদায়িনী কল্যাণী মাতা। বৈদিক ঋষি এই পৃথিবীকে মাটি, জল, বায়ু বলে মনে করেননি। তাঁর নিকট 'মাতা পৃথিবী মহীয়ং' দেশমাতা, পৃথিবীমাতা। অথর্ববেদে দ্বাদশ কাণ্ডের প্রথম সূক্তটি ভূমি সূক্ত বা পৃথ্বী সূক্ত বা মাতৃভূমি সূক্ত বলে পরিচিত। মোট ৬৩টি মন্ত্রে ভূমির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং তার প্রতি আমাদের কর্তব্যবোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভূমি বা মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্যপালন করতে হলে মাতভূমির সন্তানদের গুণ, প্রবৃত্তি এবং মানসিকতা কীরূপ হতে হবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। এই কাজে যে ধরনের বাধা বা সংকটের সম্ভাবনা এবং সেগুলির নিবারণের সূত্রও জানানো হয়েছে। এই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অবধারণা এবং 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর ভাবনাগুলিকে বিকশিত, পোষিত এবং ফলিত করার জন্য দিশানির্দেশ রয়েছে এই ভূমি-সূক্তে। এই সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নাম অথর্বা।

প্রথম মন্ত্রে— 'সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি।'.. — বলা হচ্ছে সত্যনিষ্ঠা, বিস্তৃত যথার্থ বোধ, দক্ষতা, ক্ষাত্রতেজ, তপশ্চর্যা, ব্রহ্মজ্ঞান এবং ত্যাগ-বলিদান— এই সকল ভাব ভূমি অর্থাৎ মাতৃভূমির পালন-পোষণ এবং সংরক্ষণ করে। অতীতকালীন এবং ভবিষ্যতে আসবে এমন সকল জীবকে পালনকর্ত্রী মাতৃভূমি আমাদের বিস্তৃত স্থান দিন।

তৃতীয় মন্ত্র— আমাদের জন্মভূমি সুনীল জলধি এবং নদী বিধৌত, জলপূর্ণ, যেখানে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ধনধান্য পুষ্প ভরা, যেখানে সকলেই সুখী, সকলে উদ্যমী ও সংগঠিত— এইরূপ মাতৃভূমি আমাদের শ্রেষ্ঠ ভোগ্য পদার্থ এবং ঐশ্বর্য প্রদান করুন।

পঞ্চম মন্ত্র— আমাদের যে ভূমিতে 'যস্যাং পূর্বে পূর্বজনা বিচক্রিরে...' প্রাচীন ঋষিরা বিবিধ পরাক্রমী কার্য সম্পাদন করেছেন, যেখানে দেব-সমর্থক বীরেরা আসুরী শক্তির সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে পরাস্ত করেছেন, সকল প্রাণীকে যেখানে আশ্রয় দিয়েছেন, সেই মাতৃভূমি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শৌর্য-বীর্য এবং ঐশ্বর্য সম্পন্ন হোক।

আমাদের মাতৃভূমি 'বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা' (মন্ত্র-৬) বিশ্বের সকল জীবের পোষণকারী যেখানে 'যস্যামাপঃ পরিচরাঃ সমানীরহোরাত্রে' (মন্ত্র-৯) পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা সর্বত্র ভ্রমণ করে দিবারাত্র সজাগ থেকে শীতল জলের ন্যায় সমদৃষ্টিসম্পন্ন উপদেশ দ্বারা জ্ঞানের আলোক ছড়িয়ে দিচ্ছেন। 'সা নো ভূমির্বি সৃজতাং মাতা পুত্রায় মে পয়ঃ (মন্ত্র ১০)— এই ভূমি, মা যেমন সন্তানকে দুগ্ধপান করান, তেমনি আমাদের অন্নদান করেন। 'গিরয়স্তে পর্বতা হিমবন্তো হরণ্যং তে পৃথিবি স্যোনমস্তু।' (মন্ত্র - ১১) — হিমাচ্ছাদিত পর্বত এবং অরণ্যানী আমাদের সুখদায়ক হোক, আমরা যেন কখনও পরাজিত না হই, সর্বদা অনাহত থাকি। 'পবস্ব মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ' (মন্ত্র - ১২)— এই ধরণী আমাদের মাতা, আমরা সকলে তাঁরই সন্তান।

আলোচ্য সূক্তে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে এদেশের মাটি আমার মাথার মণি, দেশের ধূলি, প্রস্তর-কঙ্কর সকলই নমস্য। প্রতিটি কঙ্করে শঙ্কর বিরাজিত (মন্ত্র - ২৬) আমাদের চলাফেরায়, ওঠাবসায় হে মাতৃভূমি 'মা ব্যথিষ্মহি ভূম্যাম্' (মন্ত্র - ২৮) তোমায় যেন ব্যথা না দিই। চাষাবাদ, খনিজ পদার্থ আহরণ, ভূমিশয্যায় থাকাকালীন হে মাতৃভূমি তোমায় যেন পীড়িত না করি। (স্মর্তব্য প্রাতঃস্মরণ— সমুদ্রবসনে দেবি পর্বতস্তনমণ্ডলে বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যম্ পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে)। পরিশেষে ৫৬ সংখ্যক মন্ত্রের উল্লেখ করি— ভূমিতে গ্রাম-নগর-অরণ্য-সভায় যেখানে যেখানে সংগ্রাম

এবং যুদ্ধ-মন্ত্রণা সম্পন্ন হয়, সেখানেই হে দেশমাতৃকা তোমাকে বন্দনা করি। 'চারু বদেব তে।'

৩২ সংখ্যক মন্ত্রের সঙ্গে শ্রী শ্রী চণ্ডীর মধ্যে দেবগণের দ্বারা দেবী স্তুতির (শ্লোকঃ ৪/২৫-২৭) বেশ মিল দেখা যায়। বৈদিক ঋষির প্রার্থনা— হে ভূমে! আমাদের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ এবং উপর-নীচ সকল দিকেই আপনি প্রহরী রূপে সংরক্ষণ করুন। আমাদের কল্যাণকারী হোন। দুষ্ট শত্রুরা আমাদের যেন অধীন না করতে পারে, শত্রু ধ্বংস করে আমাদের মুক্ত রাখুন। এদিকে মহিষাসুর বধের পরে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণের আর্তি এবং দেবীস্তুতি 'প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে। .... অস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ।' হে চণ্ডিকে, আপনার শূলের দ্বারা আমাদের পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে এবং দক্ষিণে সর্বত্রই আমাদের রক্ষা করুন।

বেদের ঋষিদের কামনা (মন্ত্র ৪০-৪২) প্রাচীন ধরিত্রী আমাদের বাঞ্ছিত ধন প্রদান করুন, ঐশ্বর্য আমাদের সহায়ক হোক (অর্থ যেন কামের দাস না হয়)। যে ভূমিতে 'যস্যাং গায়ন্তি নৃত্যন্তি ভূম্যাং মর্ত্যা ব্যৈলবাঃ।'.. মানুষ আনন্দে নৃত্য-গীত করে, যারা শৌর্যযুক্ত হয়ে রাষ্ট্ররক্ষার্থে যুদ্ধরত হয়, যেখানে শত্রুর ক্রন্দন এবং কাড়া-নাকাড়ার বাদ্যগর্জন শ্রুত হয় সেই পৃথিবী আমাদের শত্রুবিহীন করুন। যে ধরণী সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, যেখানে বিদ্বান, শূরবীর, ব্যবসায়ী, শিল্পকার এবং সেবক— এই পাঁচ প্রকারের লোকেরা সানন্দে বাস করেন সেই ভূমিকে নমস্কার করি। চণ্ডীতেও দেখি (৪/১০)— 'আপনি বেদত্রয়রূপা ও সর্বৈশ্বর্যময়ী। আপনি বিশ্বপালনের জন্য কৃষি, গো-পালন ও বাণিজ্য বৃত্তিস্বরূপ এবং সমগ্র জগতের দুঃখহারিণী।

মৃন্ময়ী মাতৃভূমির যে চিন্ময়ী রূপ, তা আমরা বৈদিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন রূপে দেখে এসেছি। তন্ত্রে, মন্ত্রে, পুরাণ, উপপুরাণে, কথায়, গানে, নাটকে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে এদেশ দেবভূমি-কর্মভূমি-মোক্ষভূমি, স্বয়ং নারায়ণ শ্রীহরির ক্রীড়াঙ্গন। এদেশ হলেন জগন্মাতা, জগদ্ধাত্রী।

চণ্ডীর ভাষায় 'মেধাসি দেবি'— বে মেধাস্বরূপিণি সরস্বতি! 'দুর্গাসি', 'শ্রীঃ', 'গৌরী' (শ্লোক - ৪/১১) আপনি ভাবসাগর পারের তরণী, আপনি নারায়ণের লক্ষ্মী, মহাদেবের গৌরী। এই দেশমাতৃকা যেমন শুধু মাটি নয়, 'মা'টি, তেমনই আমাদের সমাজ তো বিরাট রাষ্ট্রপুরুষ, যার সহস্রশীর্ষ, সহস্র নয়ন, সহস্র চরণ যার মধ্যে সমস্ত প্রাণী, সমস্ত জগৎ অধিষ্ঠিত। (যজুর্বেদ, ৩১ অধ্যায়) এই বিশাল সমাজ সেই একই রাষ্ট্রপুরুষের অধীন। এদেশের অধিবাসীরা বিশ্বাস করে প্রতিটি জীবের মধ্যে শিবের বাসই নয়, 'হর কঙ্করমেঁ শঙ্কর বিরাজে'। উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন মৈত্রেয়ীকে— 'ন বা অরে মৈত্রেয়ী পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয় ভবতি আত্মানস্তু কামায় পতিঃ প্রিয় ভবতি।' অয়ি মৈত্রেয়ি! স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসেন, কারণটা তিনি তাঁর স্বামী বলে নয়, তাঁর মধ্যে আত্মা আছে বলে।' এই দার্শনিক পটভূমিকায় বিশ্ব মৈত্রী বন্ধনের সাধনা প্রসঙ্গে কবিগুরু বলেছেন—

'হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গল সম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে।.... ভারতবর্ষ সৈন্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্বেজিত করিয়া ফিরে নাই। সর্বত্র শান্তি, সান্ত্বনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানুষের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে, তাহা তপস্যার দ্বারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্তিত্বের চেয়ে বড়ো।' (সংকলন ঃ পৃ- ৫৩-৫৮)

'ভারততীর্থ' কবিতায় তাই কবি বলেছেন—

''সেই সাধনার, সে আরাধনার, যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার।

হেথায় সবারে হবে মিলিবারে, আনত শিরে।

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।''

১৮৭৬ সালে ভূদেব জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে 'অধিভারতীকে' বন্দনা করলেন—

''মাতর্নমামি ভবতীং সতীদেহরূপাং

মাতর্নমামি বসুধাতল-পুণ্যতীর্থাং

মাতর্নমামি পদযুগ্মধৃতসমুদ্রাং

মাতর্নমামি হিমগৌরকিরীটভূষাম্।।'...

এই স্তুতির আর এক প্রকাশ মূর্ত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এ (১৮৮২ তে প্রকাশিত)। 'এই মন্ত্রসঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্' রচিত হয় ১৮৭৬ সালে। কিছু দিনের মধ্যেই 'বন্দে মাতরম্' এই ধ্বনি নিষ্কাম কর্মযোগ এবং দেশমাতৃকার মুক্তি যজ্ঞে আত্মাহুতির অগ্নিমন্ত্রে পরিণতি লাভ করল।' এই প্রসঙ্গে স্বর্গতঃ মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকরের 'চিন্তাচয়ন' গ্রন্থের ১ম খণ্ড থেকে 'আমাদের মাতৃভূমি সুমহান দিব্যরূপ'-এর প্রথম অংশ (পৃঃ ১২১-১২২) উদ্ধৃত করা হল—

''ভারত এক অতি পবিত্র দেশ, যার স্তুতি দেবতারা পর্যন্ত করেছেন—

গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি ধন্যাস্তু যে ভারতভূমিভাগে।

স্বর্গাপবর্গাস্পদহেতুভূতে ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ।।

(ভারত হল স্বর্গ ও মোক্ষের সিংহদ্বার। এই দেশে যেসব মানব জন্মগ্রহণ করে, তারা স্বয়ং দেবতাদের থেকেও ধন্য— দেবতারা এই রকম স্তুতিগান করেন)।

— মহাযোগী অরবিন্দ এই ভূমিকে জগজ্জননীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি বলে বর্ণনা করেছেন। তিনিই জগন্মাতা, আদিশক্তি, মহামায়া ও মহাদুর্গা এই মূর্ত রূপে পরিগ্রহ করেছেন, যাতে আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারি ও তাঁর পূজা করতে পারি।

— এই ভূমিকেই আমাদের দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এইভাবে বন্দনা করেছেন—

''অয়ি ভুবন মনমোহিনী.... নীল সিন্ধুজল ধৌত চরণতল।''

— এই ভূমিকেই আমাদের স্বাধীনতার ঋষি কবি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অমর সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্'-এ প্রণাম জানিয়েছেন, যে গান কত সহস্র দেশপ্রেমিক যুবকদের হৃদয়কে আবেগে আপ্লুত করেছে, যার ফলে তারা হাসতে হাসতে দেশের স্বাধীনতার জন্য ফাঁসির মঞ্চে উঠেছে। কবি গেয়েছেন—

'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'—

— এই ভূমিকেই আমাদের সকল দ্রষ্টা ঋষিমুণিগণ 'মাতৃভূমি', 'ধর্মভূমি', 'কর্মভূমি' ও 'পুণ্যভূমি' এবং বাস্তবিক 'দেবভূমি' ও 'মোক্ষভূমি' বলে অভিহিত করেছেন।

— এই ভূমি সুপ্রাচীন কাল থেকে আমাদের পরম প্রিয় ও পবিত্র ভারতমাতা, যাঁর পুণ্য নাম শুনলেই আমাদের হৃদয় তাঁর প্রতি অসীম ভক্তিতে ভরে ওঠে।

— হ্যাঁ, ইনিই আমাদের সকলের জননী, আমাদের সুমহান মাতৃভূমি।'

চণ্ডীচেতনার সঙ্গে দেবভাবনা ও দেশভাবনায় মিলিত হয়ে কবিগুরু শারদপ্রাতে মহাশক্তির বন্দনা করেছে—

''ওগো মা তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।''

তথ্যসূচী :—

১) ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ সংহিতা— (সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীরাম শর্মা আচার্য, শান্তিকুঞ্জ, হরিদ্বার)। ২) শ্রীশ্রীচণ্ডী (অনুবাদ ও সম্পাদনা : স্বামী জগদীশ্বরানন্দ)। ৩) ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার — ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী। ৪) চিন্তাচয়ন (১ম খণ্ড) — শ্রীগুরুজী (মাধবরাও গোলওয়ালকর)। ৫) শ্রীমহানামব্রত প্রবন্ধাবলী (১ম খণ্ড) এবং অন্যান্য।

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ—

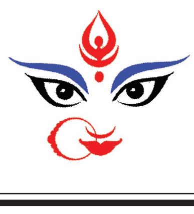

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

এম. ডি. বাঁকুড়া

প্রয়াগে কুম্ভমেলায় ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্য স্নান।

ভারতবর্ষ বনাম ইন্ডিয়া

অমলেশ মিশ্র

ইংরাজদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরকে আমরা স্বাধীনতা নাম দিয়েছি এবং ব্যবহার করে আসছি। সেটি ছিল ১৯৪৭ সাল। ভারতবর্ষের শাসনভার এল ভারতবাসীর হাতে। ইতিমধ্যেই ভারতবাসী দুটি গোষ্ঠীতে অলিখিতভাবে বিভক্ত হয়ে গেছেন। কেউই সেটা লক্ষ্য করলেন না। যদি বা কেউ করলেন, চিন্তিত হলেন না। কারণ, তাতে তাঁদের কোনও ক্ষতি ছিল না। ভারতবাসী যে দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ হলেন সে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে একটি গোষ্ঠী ইন্ডিয়ান আর একটি গোষ্ঠী ভারতীয়। ইন্ডিয়ানদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, তাঁরা ইংরেজী কায়দা-কানুনগুলি ভাল রপ্ত করেছেন। তাঁদের চেহারা থাকল ভারতবাসীর মতো কিন্তু মনন ও চিন্তন হয়ে গেলে ১০০ ভাগ বিদেশী প্রভাবিত। একে তাঁরা বললেন— প্রগতিশীলতা। সমাজ এবং দেশের সব স্তরেই এঁরা হলেন প্রধান ব্যক্তি— এঁদের কথায় সমাজ এবং দেশ চলতে লাগল। এঁরা কাদের দ্বারা প্রভাবিত, কীভাবে প্রভাবিত এবং তাঁর ফলে এই রাষ্ট্রের মর্যাদা ও সম্মান কোথায় যাচ্ছে বা যেতে পারে তা নিয়ে কেউ ভাবলেন না। বিলাত ফেরত হলেই তিনি একজন গণ্যমান্য হয়ে গেলেন। এঁদের সংখ্যা সর্বমোট রাষ্ট্রবাসীর ১০-১৫ শতাংশের বেশি ছিল না। ইংরাজরা যেমন ভারতবাসীদের মনে করতেন তাঁদের দায় বলে তেমনি এই ইন্ডিয়ানরা মনে করতেন যে, ভারতীয়রা ইন্ডিয়ানদের দায়। ইন্ডিয়ান মাত্রেই প্রগতিশীল, বিবেচনাসম্পন্ন, ভারতপ্রেমী, দেশের মানুষের উন্নতির জন্য সদাই চিন্তিত। আর ভারতীয় মাত্রেই রক্ষণশীল, গোঁড়া, জড়বুদ্ধি বিবেচনা সম্পন্ন, আনপড় এবং গোঁয়ার, সভ্যতাঁর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে ব্যর্থ এক বিশাল

রবীন্দ্রনাথ

জনসংখ্যা, যাদের যাবতীয় উন্নতির দায় ইন্ডিয়ানদের উপরই বর্তেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সংবিধান রচিত হল। এই মানসিকতাঁর প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখা গেল ভারতীয় সংবিধানের একেবারে প্রথম ধারাতেই। "India, that is Bharat shall be a union of states"। বাংলায় রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায়— 'ইন্ডিয়া', যাকে 'ভারত' বলা যায়— সেটি রাজ্যগুলির একটি ঐক্যবদ্ধ রূপ হবে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই দেশটির দুটি নাম— 'ইন্ডিয়া' এবং 'ভারত' দেওয়া হল এবং 'ইন্ডিয়া' নামটিই প্রধান হল, যাকে 'ভারত' বলা যেতে পারে। এতকাল যে দেশটি ভারত নামেই পরিচিত ছিল, কিছু ইন্ডিয়ান (চেহারায় ভারতীয় মননে চিন্তনে বিদেশীয়ানা) প্রথম সুযোগ পেয়েই তাঁর নামটা পরিবর্তন করে দিলেন। এটা শুধু নামের পরিবর্তন নয়, চিন্তন ও মননেরও পরিবর্তন--- যা এই দেশের পরম্পরা ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইংরাজদের হাত থেকে এদেশের স্বাধীনতা লাভের যে সংগ্রাম তা ছিল মূলত ভারতবাসীর— ইন্ডিয়ানদের নয়। ইন্ডিয়ানরা ইংরাজদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতাঁর হস্তান্তর নিয়েই চিন্তিত ছিল, আর ভারতীয়রা চাইছিল যাবতীয় বিদেশীয়ানার অবসান— ভারতের পরম্পরা এবং ঐতিহ্যের পুনঃস্থাপন। একথা বলা বোধহয় ভুল হবে না যে, সহিংস বিপ্লবীরা ছিলেন মনে প্রাণে ভারতীয় এবং অহিংস বিপ্লবের কাণ্ডারীরা ছিলেন মূলত ইন্ডিয়ান। তাঁরা ইংরাজদের রাগান্বিত করতে চাইলেন না। সহিংস বিপ্লবীদের ইন্ডিয়ান নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী যৎপরোনাস্তি গাল পাড়লেন। বিলাত ফেরত হয়েও যারা ইন্ডিয়ান না বনে গিয়ে ভারতীয় ছিলেন— তাঁরা এবং তাঁদের চিন্তাধারা হয়ে গেল অপাংক্তেয়। কাউকে কাউকে তাড়িয়ে দেওয়া হল— কাউকে কাউকে সম্মান জানিয়ে নীরব রাখা হল। দেশের ভারতীয়রা মরেছিলেন বিদেশীদের হাতে, কিন্তু ক্ষমতাঁর রাশ পেয়ে গেলেন ইন্ডিয়ানরা, যেহেতু চিন্তনে ও মননে তাঁরা ছিলেন পুরোমাত্রায় বিদেশী। এই ইন্ডিয়ানদের মধ্যে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও পড়েন। স্বাধীন ভারতের চালক ইন্ডিয়ানরা তাঁর কোনও কথাকেই গুরুত্ব দেননি— একটি ছাড়া। এবং সেটি হল সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি। গান্ধীজী সারাজীবন তাই করেছেন, তাঁর নাম নিয়ে আজও যারা শাসনভার বহন করছেন, তাঁরাও তাই করছেন। ফলে জন্মলগ্ন থেকেই এই রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতাঁর বীভৎস আক্রমণ হয়েছে ভারতীয়দের ওপর।

এই ইন্ডিয়ানরা কয়েকটি আপ্তবাক্য চালু করলেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সকলের মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন। এই আপ্তবাক্যগুলির কয়েকটি হল— (১) ভারতে কোনকালেই জাতীয়তাবাদের চিন্তা ছিল না, জাতীয়তাবাদের ধারণা ইংরাজদের কাছ থেকেই পাওয়া গেছে। (২) ভারতবর্ষের মানুষ বরাবরই পরাধীন ছিল। আর্যরা এদেশ দখল করেছিল, পরে পরে গ্রীক, শক, হূন, পাঠান, মোঘল ইত্যাদিরা দখল করেছে, রাজ্য চালিয়েছে, (৩) সব ধর্মই সমান, (৪) পৃথিবীতে যোগ্যতমেরই বাঁচার অধিকার আছে, (৫) অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করতেই হবে, ইত্যাদি।

আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ভারতবর্ষ অন্যতম প্রাচীন দেশ। ইউরোপীয়রা যখন বনে জঙ্গলে নগ্ন হয়ে কাঁচা মাংস খেয়ে গ্রাসাচ্ছাদন করত, তখন ভারতবর্ষ সভ্যতা সংস্কৃতির এক সুউচ্চ অবস্থানে ছিল। ইউরোপীয় দেশগুলিতে রাজনৈতিক ধারণা জন্মলাভ করার কয়েক শতাব্দী পূর্বেই ভারতের রাজ্যগুলিতে (সেই যুগের রাজ্য এখনকার স্টেট বা রাজ্য বলতে যা বোঝায় ঠিক ততটা নয়) গণতন্ত্রসহ ব্যাপক রাজনৈতিক ধারণা প্রচলিত ছিল।

ভারতবর্ষ এবং চীন এই দুটি প্রাচীনতম সভ্যতাঁর দেশ পরিচালিত হত সমাজের ইচ্ছানুসারে, রাষ্ট্রপ্রধানের ইচ্ছানুসারে নয়। সমাজের ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানরা রাজ্য চালাতেন। তাই রাষ্ট্রপ্রধানের পরিবর্তন হলেই সমাজের পরিবর্তন হত না। সেই কারণেই সুদীর্ঘ ২৬০০ বছর ধরে বারবার বিদেশীদের (গ্রীক, শক, হুন, পাঠান, মোঘল, ইংরাজ) দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের বদল ঘটেছে বহুবার। কিন্তু সমাজ তাঁর নিজস্ব চরিত্র আজও বজায় রাখতে পেরেছে। পৃথিবীতে এমন দ্বিতীয় দেশ নেই (চীন ব্যতীত)

যে দেশের সমাজ রাষ্ট্র প্রধানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়নি।

খোদ আরব দেশসহ সমগ্র মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া, গ্রীস, রোম, সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া— কেউই তাঁদের নিজস্বতা বজায় রাখতে পারেনি। ২৩০০ বছর ধরে বারবার বহু নৃশংস, অমানুষদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ভারতীয়রা আজও তাঁর নিজস্বতা বজায় রেখেছে। বিগত অর্ধশতাব্দী বা তাঁর কিছু বেশিকাল ধরে ইন্ডিয়ানরা অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সেই পরম্পরা ও ঐতিহ্যকে নষ্ট করে দিতে। তাঁরা অনেকটাই যে সফল হয়েছেন, তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে, সংবাদ মাধ্যমের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজরে পড়ে।

ইন্ডিয়ান মাত্রেই মেকলে প্রোডাক্ট বিজ্ঞাপনের দৌলতে দুধ-এঁর থেকে যেমন হরলিক্স পুষ্টিকর, তেমনি বিজ্ঞাপনের দৌলতে মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাই দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার থেকে বেশি সমাদৃত হল। কারণ পিছনে ছিল ইংরেজ। দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে ছিল শ্রদ্ধা, সেই বস্তুটাই মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা উৎপাটন করে দিল। চালু হল ব্যাপক ভাবে ছিন্নমস্তা শিক্ষা শয়তানি স্কুলে। লর্ড কার্জন এই ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার প্রায় ৫০ বছর পরে ১৯০০ খৃস্টাব্দে ১৭ ফেব্রুয়ারি কনভোকেশন বক্তৃতায় স্বীকার করলেন, "We teach you in your Indian colleges and we examine you in the Indian Universities upon subjects not merely conveyed to you in a foreign language, but representing foreign ideas and modes of thought. They are like an aerolite discharged into space from distant planet or like exotic plantes imported from some antipodium climate"।

যে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে ইন্ডিয়ানরা ইংরেজ আমলে তৈরি হয়ে দেশের নেতৃত্বে বসেছিল— সেই শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল "unnational or denational in outlook"। যে সমস্ত মনীষী বিষয়টি বুঝেছিলেন, ষড়যন্ত্রটি ধরে ফেলেছিলেন, তাঁরা কেউই ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বে থাকতে পারলেন না। সুভাষ বোসকে তাড়িয়ে দেওয়া হল; শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ হতগ্রাহ্য হলেন। রাজনৈতিক মূল শক্তি যাদের হাতে ছিল, তাঁরা সকলেই মেকলে-পণ্য (প্রোডাক্ট) মূলত ইন্ডিয়ান। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী গোটা দেশটাকেই আত্মস্বার্থে বলি দিয়েছিলেন— না ছিল উচ্চ ও সুশিক্ষার ভিত, না ছিল দূরদৃষ্টি। নিজেকে মহাত্মা বানাতে গিয়ে দেশটাকে প্রেতাত্মা বানালেন। তাঁর মন্ত্রশিষ্য ইন্ডিয়ানরা আজও দেশের শাসনকেন্দ্রে।

মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল সুউন্নত, স্বাভিমানী ভারতীয়দের হীনমন্য করে দেওয়া। এতবড় দেশকে শাসন করার মতো ইংরাজ কোথায় পাওয়া যাবে তাই দেশীয় ইংরাজ— ইন্ডিয়ান তৈরি করতে হবে, তাই "The Indian Education on was divorced from living realities of Indian life It was unnational and denational in outlook"।

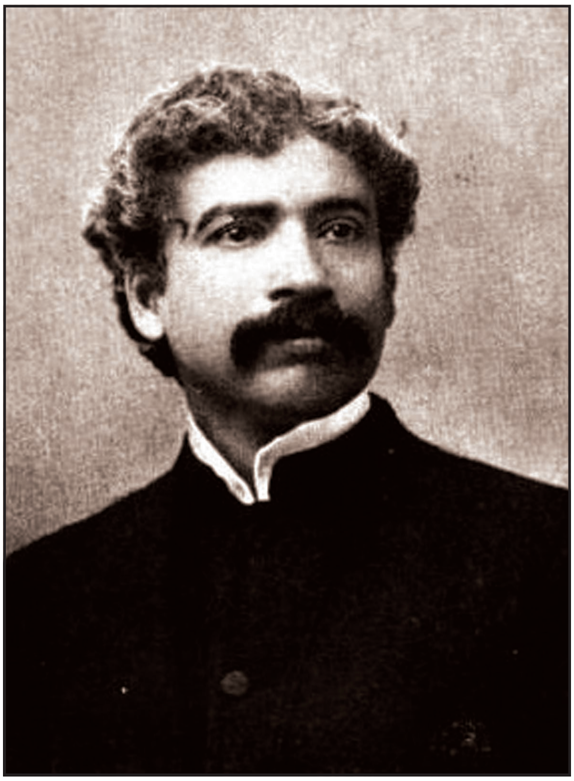

জগদীশচন্দ্র বসু

এই ইন্ডিয়ানরা ইংরাজদের কাছ থেকে যে হীনমন্যতাঁর শিক্ষা পেয়েছিলেন, তাঁর ভিত্তিতেই বললেন— জাতীয়তাবাদ জিনিসটা ইংরাজরাই আমাদের শিখিয়েছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সামগ্রিক স্বাভিমান শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, তা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গ বা লক্ষ্য কোনও কিছু রূপেই গৃহীত হয়নি। ফলে স্বাভিমান ও মূল্যবোধের যে শিক্ষা হাজার হাজার বছর ধরে এদেশের মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছিল, প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থার নামে তাকে হত্যা করা হলো। যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা শ্রীঅরবিন্দ বা রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা বলেছিলেন, তাঁর ধারেকাছে দিয়েও শিক্ষা ব্যবস্থা গেল না। ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগের পরিবর্তে কেবলমাত্র ভোগবাদসর্বস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি হলো।

স্বামী বিবেকানন্দ যে মানুষ তৈরির শিক্ষার কথা বলেছিলেন, তাঁর পরিবর্তে হয়ে গেল শিক্ষা মানে কে কত বিষয় মুখস্থ রাখতে পেরেছে। 'এডুকেশন' মানে হয়ে গেল 'ইনফরমেশন'। ভারতের সংস্কৃতি ও পরম্পরাবর্জিত ইনফরমেশন-ভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত

হয়ে ইন্ডিয়ানরা দেশের পরিচালক হলেন। দেশের মাটি ও মানুষ সম্পর্কে কোনও ধারণাই থাকল না। জানা থাকল না দেশের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস, তাঁরা গ্রীসের ইতিহাস পড়ল, রোমের ইতিহাস পড়ল, বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস পড়ল, কিন্তু ভারতের ইতিহাস পড়ল না। কীভাবে একটা দেশের সাধারণ নাগরিক খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দের বিদেশী আক্রমণ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৩০০ বছর ধরে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিল তা জানল না। শিক্ষা পাঠক্রমে তা থাকল উপেক্ষিত এবং অনুপস্থিত। একের পর এক কতগুলি বিদেশী শক্তি এদেশের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁর অর্থ, তাঁর ধর্ম, তাঁর সংস্কৃতি বিনষ্ট, এমনকি বিলুপ্ত করতে চেয়েছিল, কীভাবে ভারতবাসী সুদীর্ঘ ২৩০০ বছর ধরে সেই বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করে এই সমাজ, এই সংস্কৃতি ও এই ধর্ম রক্ষা করেছিল তা ইন্ডিয়ানরা জানল না। কেবলমাত্র ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে ৫০ বছরের লড়াইকে তাঁরা জানল, জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতাঁর আন্দোলন। বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম যদি স্বাধীনতা আন্দোলন হয়, তাহলে দেশ যাতে বিদেশী শাসকের হাতে চলে না যায়, তাঁর আন্দোলন বা সেই সংগ্রামকে কী নাম দেওয়া যাবে? দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ এবং স্বাভিমান না থাকলে গ্রীক, শক, হুন, পাঠান, মোঘল এবং ইংরেজদের আক্রমণ থেকে এই ভারতবর্ষকে রক্ষা করা যেত? পৃথিবীর সব দেশই বিদেশী আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে বিদেশী ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। তাঁদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের কথা কেউ এখন জানে না। আরব দুনিয়া ইসলামিয়ানার আগে কী ছিল তাঁর কোনও ইতিহাস পাওয়া যায়? ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যে ২৩০০ বছর ধরে আক্রান্ত হয়েও নিজের দেশকে স্বকীয়তায়, স্বাভিমানে উজ্জ্বল রেখেছে। তা করেছে ভারতীয়রাই, ইন্ডিয়ানরা নয়। তাই আজ ধর্ম, সংস্কৃতির কিছু অবশিষ্ট আছে। সব ধর্মই সমান, ভারতের সংস্কৃতি একটি মিশ্র সংস্কৃতি ইত্যাদি কিছু ভিত্তিহীন চরিত্রহীন বাক্যজালে সব কিছু ব্যাখ্যা করে নিজস্ব সুখ সুবিধা আদায় করছেন ইন্ডিয়ানরা। তাঁদের অর্থনীতি ভারতীয়দের স্বার্থে নয়, বিদেশীদের স্বার্থে। অজুহাত— বিশ্বায়ন। তাঁদের রাজনীতি আদর্শহীন, আত্মসেবা। ক্ষমতাঁর জন্য যে কোনও সমঝোতা অর্থাৎ চরিত্রহীন রাজনীতি।

ভারতীয়রা নাকি ইংরাজদের কাছ থেকে জাতীয়তাবাদ শিখেছে। নিজের দেশ সম্পর্কে কী পরিমাণ অজ্ঞ হলে এমন উন্মাদ উক্তি করা যায়, তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। এই ইন্ডিয়ানরা কি ভারতের শাস্ত্রীয় মন্ত্রগুলির একটিও জানেন না? 'গঙ্গেচ যমুনেচৈব' অতি পরিচিত মন্ত্র। এছাড়াও দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, পঞ্চ সরোবর, সপ্ত অরণ্য, চার ধাম, ৫২ পীঠ ইত্যাদি কি ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের কথা বলে না? আসলে যে ইংরেজরা আমাদের ন্যাশনালিজম্-এঁর কথা শুনিয়েছেন এবং যে ইন্ডিয়ানরা তা অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করেছেন, তাঁরা মূলত শূন্যগর্ভ। তাঁরা নিজেদের দেশের কোনও খবরই রাখেন না। তাঁরা এতই স্বাভিমানহীন, হীনমন্য যে তাঁরা বিদেশীদের বেশি বিশ্বাস ও ভক্তি করে। শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা আম্বেদকর— এঁদের কথায় বিশ্বাস করলে চাকুরিও হয় না, প্রমোশনও হয় না। তাই স্বদেশের ঠাকুরের থেকে বিদেশী অনেক ভাল। জাতীয়তাবাদের ধারণা কি মহাভারত থেকে পাওয়া যায় না?

আধুনিক ভারতের অনুন্নতি ও অনগ্রসরতাঁর পিছনে বড় ভূমিকা আছে ইন্ডিয়ানদের এই হীনমন্যতা। বুদ্ধিমান বিদেশী শাসকরা সবসময়ই বিশ্বাস করত যে, একটি জাতির সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করতে পারলেই দেশটিকে শাসন করা যাবে। যাদের শাসন করতে হবে তাঁদের থেকে শাসক হিসাবে তাঁরা যে উন্নত তা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাই এতাবৎ ভারত আক্রমণকারী বিদেশী শক্তিগুলির কেউ কেউ বিশাল সামরিক বাহিনী নিয়ে এসেছিল, কেউ কেউ এদেশের ধর্মকে নস্যাৎ করে নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিল, কেউ কেউ এদেশের ইতিহাস বিকৃত করেছিল। উদ্দেশ্য একটাই— এই সুবিশাল ঐতিহ্যমণ্ডিত, জ্ঞানগরিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত দেশটির মানুষগুলিকে হীনমন্য করে দিতে হবে। তবেই এঁদের শাসন করা সম্ভব হবে। সামরিক বাহিনী, ধর্মগ্রন্থ ও তরবারি এবং বিকৃত ইতিহাস এগুলি ছিল তাঁদের অস্ত্র। কিন্তু আগেই উল্লেখ করেছি যে, পৃথিবীর দুটি দেশ ভারতবর্ষ এবং চীন ছিল সমাজপ্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান নয়। অন্যান্য দেশে শাসক পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজের বিলুপ্তি ঘটেছে। খুঁজলেও পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতে ২৩০০ বছর ধরে বিদেশী হানা হয়েছে, রাষ্ট্রপ্রধান পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজ সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হয়নি। এখনও ভারতীয়দের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায়। পাওয়া যায় তাঁদের ধর্ম সংস্কৃতির অবিকৃত রূপ। তাঁর বিকৃতির চেষ্টা ইন্ডিয়ানরা বিদেশীদের সঙ্গে একযোগে করেছেন। অনেকটা সফলও হয়েছেন। তবুও তাঁর মূল চেহারাটা পাওয়া যায় বিকৃত অংশকে দূরে সরিয়ে। একটা উদাহরণ হয়ত যথেষ্ট হবে। ৬৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারতবর্ষে ইসলাম আক্রমণ শুরু হয়। প্রায় এক হাজার বছর ধরে ইসলামী শাসকরা তাঁদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে— 'হয় ইসলাম, না হয় মৃত্যু'— এই তত্ত্ব প্রচলন করে। সব থেকে উদার পদ্ধতি ছিল জিজিয়া কর দিয়ে পরিত্রাণ পাওয়া। বর্তমান পৃথিবীর ঐশ্লামিক দেশগুলি এই ভাবেই তৈরি হয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ভারতবর্ষ। ভারতীয়রা মৃত্যুবরণ করেছেন, তবু ধর্ম ত্যাগ করেননি। কিন্তু কিছু ভারতীয় ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভারতে ইসলাম বিস্তৃতির একমাত্র কারণ— হয় ইসলাম, না হয় মৃত্যু। ভারতীয় বৌদ্ধরা অহিংসক হওয়ায় ইসলামের সঙ্গে কোনও সংঘর্ষে যাননি। তাঁরা দলে দলে নেড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন।

ইন্ডিয়ান ঐতিহাসিকরা এই ঘটনার ব্যাখ্যা করলেন এইভাবে যে—ভারতে জাতিভেদ ব্যবস্থা এতই নিষ্ঠুর ছিল, যে নীচু জাতির লোকেরা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হয়। তরবারি দেখিয়ে

ইসলামীকরণের ইতিহাসটা তাঁরা লুকিয়ে রাখলেন। আবার একথাও লুকোলেন যে, ইসলামীদের মধ্যেও জাতিভেদ, উচুঁ-নীচু আছে। এখনও ভারতবর্ষের মুসলমানরা পাকিস্তানে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ বলে পরিচিত। যে সুরাবর্দী সাহেব ১৯৪৬ সালে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং করলেন এবং পাকিস্তানের সমর্থনে নির্বাচন করিয়ে ১২১টি মুসলিম আসনের ১১৮টি জিতেছিলেন। পাকিস্তানদরদী মুসলমান সুরাবর্দী পাকিস্তানে কল্কে পাননি। অপমানিত অবহেলিত এবং লাঞ্ছিত হয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইন্ডিয়ান ঐতিহাসিকরা একথাও লিখলেন না যে, জাতিভেদ ব্যবস্থা নিষ্ঠুর অবস্থা ইসলামীকরণের

মেকলে

প্রক্রিয়া নিষ্ঠুরতর। কিন্তু তাঁরা যে কত বড় আহাম্মক তা প্রমাণ হয়ে গেল যখন একটি প্রশ্নের জবাব তাঁরা দিতে পারলেন না। প্রশ্নটি হল— ভারতে জাতিভেদ ব্যবস্থার কারণে না হয় নীচু জাতির লোকেরা দলে দলে মুসলমান হয়েছিল, কিন্তু যে সব দেশে জাতিভেদ ব্যবস্থা ছিল না, খোদ আরব বা মিশর ইত্যাদি দেশ ঐশ্লামিক দেশ হয়ে গেল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর ইন্ডিয়ানদের কাছে নেই। কিন্তু ক্ষমতা, শিক্ষা জগত এবং সংবাদ মাধ্যম জগত তাঁদের মুঠোয়। তাই তাঁরা ইতিহাস লিখতে গিয়ে বললেন, হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ ব্যবস্থা এদেশে ইসলাম বিস্তারের কারণ। এঁরা শুধু সত্যকে চাপা দেন তাই নয়, এঁরা মিথ্যা প্রচার করেন, হয়ত অর্থের বিনিময়ে।

অর্থের বিনিময়ে মিথ্যা প্রচারের যুগান্ত সৃষ্টিকারী, সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনীটি হল আর্য আক্রমণ তত্ত্ব।

ইংরাজদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই ভারতের পুনর্জাগরণ ও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু সে সুযোগ ক্ষমতাভোগীরা গ্রহণ করেননি, করতেও দেননি। দাসত্বের মনোভাব থেকে তাঁদের মানসিক মুক্তি ঘটেনি, তাঁরা মুক্ত হতেও চাননি। জুতো পালিশের মজুরি বাবদ এক টাকার জায়গায় যারা ১০ টাকা পেল, তাঁরা আর জুতো পালিশের কাজ ছাড়তে চাইল না। উত্তরাধিকারীদের বলল, এক টাকার জায়গায় 'বাবু'রা ১০ টাকা দিচ্ছেন, এতেই আমার গাড়ি-বাড়ি সব হবে। অতএব ওইসব স্বাভিমান, আত্মমর্যাদা ইত্যাদির বুলি ছাড়। দেখছ না আমরা কত সুখে আছি। ওঁরা কত মহান। ওদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই, যা বলছেন বিশ্বাস করো।

ম্যাক্স মূলার

মেনে নাও। দু'দিন বইতো নয়। এক কথায় পরানুকরণ এবং তা বংশপরম্পরায় হয়ে গেল পাথেয়। শিষ্টাচার (ওয়েলকাম, থ্যাংক ইউ, সরি), পোষাক (কোট-প্যান্ট-টাই), খাদ্যাভ্যাস (ব্রেড-বাটার, জ্যাম-জেলি)— সবেতেই চলল অনুকরণ দাসত্ব। দাসত্ব থাকল চিন্তাজগতেও। দেশের মনীষী কোন বিষয়ে কী বলেছেন তাঁর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কোন বিদেশী টম-ডিক-হ্যারি ওই বিষয়ে কি বলেছেন।

রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ৬৫ বছর পরেও বাড়ির ছেলে গলায় টাই বেঁধে স্কুল গেলে গর্ব হয়, টাই বাঁধা স্কুলে বাচ্চা ভর্তি হতে না পারলে হতাশার শেষ নেই। তাই পাড়ায় পাড়ায় বিদেশী শিক্ষাবিদদের নামে নামে মন্তেসরী, কিন্ডারগার্টেন— সব জায়গায় টাই বাঁধার ব্যবস্থা আছে।

শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য মানবিক উন্নতি নয়, আর্থিক উন্নতি। বরং বলা যায়, মানবিক উন্নতির মূল্যে আর্থিক উন্নতি। অর্থ

পুরুষার্থে এবং কাম পুরুষার্থের সাধনা ধর্ম পুরুষার্থে ও মোক্ষ পুরুষার্থকে বলি দিয়ে। (১) যোগ্যতমের বাঁচার অধিকার, (২) অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম, (৩) প্রকৃতিকে জয় করো স্লোগান নিয়ে সকলেই পরস্পরের সঙ্গে ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ, প্রতিহিংসা, নিয়ে প্রতিযোগিতায় সামিল। কেউ ভেবেও দেখল না যে এইসব বুলির বয়স ছয়শত বছরের বেশি নয় এবং পৃথিবীর বিকাশ ওইসব তত্ত্ব অনুযায়ী হয়নি। অন্তত ভারতবর্ষের শিক্ষা এটা নয়। এই তত্ত্ব ইউরোপীয়দের এবং এই তত্ত্ব অমানবিক। পৃথিবীতে সকলেরই বাঁচার অধিকার আছে এবং প্রতিহিংসা ও প্রতিযোগিতা মানব উন্নয়নের ভিত্তি নয়। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় মনীষীদের শিক্ষা-চিন্তার কোনও সম্পর্কই নেই।

ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সবসময়ই শরীর, মন, বুদ্ধি এবং আত্মা— এই চারটি সত্তার শিক্ষার কথা ছিল, বিদেশীরা যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করল, তাতে এই শিক্ষার কথা থাকল না। থাকল শুধু অর্থোপার্জনের চিন্তা এবং তাও যে কোনও মূল্যে।

এই শিক্ষা ব্যবস্থা জন্ম দিল আত্মকেন্দ্রিক, আক্রমণমুখী, উচ্চাকাঙ্খী, লোভী, শ্রদ্ধাহীন প্রতিযোগিতা-প্রিয় প্রজন্মের। তাই আমরা শান্ত, অহিংস, সমন্বয়ী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনও সমাজ পেলাম না।

প্রয়োজন ছিল আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রাচীন প্রজ্ঞার মিশ্রণে একটি বিজ্ঞানমনস্ক ধার্মিক প্রজন্ম সৃষ্টি করা।

রাজনীতি, শিক্ষা ও সংবাদ মাধ্যমসহ সমস্ত উচ্চ ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ানদের দাপট ভারতীয়দের সেই পথে যেতে দেয়নি। ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগের দর্শনকে কেবলমাত্র ভোগবাদী দর্শন দিয়ে ভুলিয়ে দিয়েছে। ফলে বিজ্ঞানমনস্ক ধার্মিক প্রজন্ম আসেনি, এসেছে আত্মকেন্দ্রিক, আক্রমণমুখী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, লোভী, শ্রদ্ধাহীন, প্রতিযোগিতাপ্রিয় এক প্রজন্ম— যে ভোগের জন্য সব কিছুই ত্যাগ বা বিসর্জন দিতে রাজি। দেহ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার যে শিক্ষা প্রয়োজন ছিল তা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, যোদ্ধা ভারতবর্ষ ২৩০০ বছর ধরে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশ তা করেনি। ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং প্রায় সব রাজ্যেই বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে। দেশের ধর্ম এবং সংস্কৃতিই, এক কথায় আধ্যাত্মিকতাই ছিল জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। এখনও দেখা যায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় কোনও আঞ্চলিক দল এসেছে, সেও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বিরোধ করছে, এমন অনেক ব্যবস্থা নিচ্ছে যা জাতীয়তাবাদ বিরোধী। যদি প্রশ্ন করা যায় যে, বর্তমান ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি কী? কোনও সুচিন্তিত উত্তর পাওয়া যাবে না। জাতীয়তাবাদ বলতে ভারতের মানচিত্র এবং জাতীয় পতাকা। এই পতাকা এবং এই দেশের প্রতিও একাত্মতা বোধ করেন না এমন জনগোষ্ঠী বিরল নয়। জাতীয়তাবাদের মূল কথা— একাত্মতা, যা কেবল ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। যে দেশের মানুষের মধ্যে এই একাত্মতা, এই ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে ওঠেনি, সে দেশ বহিরাক্রমণে প্রথম ধাক্কাতেই কাবু হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতি বিশ্বাস এত গভীরে প্রোথিত যে ২৩০০ বছর ধরে গ্রীক, শক, হুন, পাঠান, মোঘল, ইংরেজ আক্রমণ করেও সুবিধা করতে পারেনি। জাতীয়তাবাদের এত বড় প্রমাণ হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও বলা হয় যে, জাতীয়তাবাদের ধারণা ইংরাজরা আমাদের দিয়েছে। ইতিহাসে অজ্ঞতা ও মূঢ়তা কত গভীরে গেলে, হীনমন্যতা কত ব্যাপক হলে এই ধরনের সিদ্ধান্ত করা যায় তা ভাবলে বিস্ময় জাগে।

মনে রাখতে হবে, ইউরোপীয় সভ্যতাঁর ইতিহাস আদৌ প্রাচীন নয়। ভারতের তুলনায় একান্তভাবে অর্বাচীন। আজ যে সমস্ত 'কনসেপ্ট' বা ধারণা নিয়ে এত হৈচৈ তা ইউরোপে এসেছে মাত্র ৬০০ থেকে ৮০০ বছর আগে। এবং তাও একটি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে।

বলা হয়ে থাকে যে, পাশ্চাত্যে আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে কনস্টানটিনোপল-এঁর পতন (১৪৫৩ খৃঃ)-এঁর পরে। অর্থাৎ পাশ্চাত্য জগতে আধুনিক চিন্তাধারার জন্ম হয়েছে মাত্র ছয়শত বছর আগে। প্রচারের কায়দায় এই ছয়শত বছরের চিন্তাকেই আবহমানকালের চিন্তা বলে প্রতিষ্ঠা করার কাজ হয়েছে। পৃথিবীর সভ্যতা এবং সংস্কৃতির জন্ম ও বিস্তার অতি দীর্ঘকালের। সেই কালের মধ্যে ছয়শত বছর একেবারেই নগণ্য।

এই ছয়শত বছরে ইউরোপীয় সমাজ ও জীবনধারা তিনটি ভাবনা ও দর্শনকে নিয়ে আবর্তিত হয়েছে—

(১) জাতীয়তাবাদ, (২) গণতন্ত্র, (৩) সমাজবাদ।

এই তিনটি দর্শনই ইউরোপে এসেছে প্রতিক্রিয়া হিসাবে, নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। স্বাভাবিক ভাবে আবর্তিত হয়নি।

ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছিল রোমান সাম্রাজ্য ও পোপের ঈশ্বরীয় শাসনের প্রতিবাদে। সম্রাট ও রাজারা ধনী বণিক সম্প্রদায় এবং নতুন তৈরি হওয়া বুদ্ধিজীবীরা চাইলেন বা দাবি করলেন যে রাষ্ট্র-বহির্ভূত কোনও শক্তি, কর্তৃত্ব বা ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তি ও জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে উঠল ইউরোপে।

পোপের ক্ষমতা চলে যাওয়ার পর রাজা এবং সম্রাটরা নিজ নিজ ভূখণ্ডে চূড়ান্ত শক্তিধর হয়ে উঠলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন যে, রাজা ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত— রাজা কোনও অন্যায় করতে পারেন না। রাজার এই চূড়ান্ত ক্ষমতাঁর প্রতিবাদে রাষ্ট্রীয় কাজে জনগণের অংশগ্রহণের দাবি উঠল। ইউরোপীয় গণতন্ত্রের আন্দোলন ম্যাগনাকাটা (১৫ জুন, ১২১৫) থেকে শুরু হয়েছে বলা যায়।

শিক্ষা বিপ্লব ও অন্যান্য আবিষ্কার শিক্ষাভিত্তিক অর্থনীতি

ও উৎপাদন ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছিল। যারা ঘরে বসে উৎপাদন করত, তাঁরা হয়ে গেল কারখানার শ্রমিক। এই শ্রমিক শোষণের প্রতিবাদে জন্ম নিল সমাজবাদ।

সমাজবাদের ব্যর্থতা ও অপরিপূর্ণতা জন্ম দিল কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ধারণা।

পাশ্চাত্য তত্ত্বগুলির একটি সাধারণ লক্ষণ হল— এগুলি সবই জন্মলাভ করেছে প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবাদ থেকে। জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছে পোপের সর্বময় প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্রের জন্ম হয়েছে রাজার সর্বময় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়েছে ধনতন্ত্রের প্রতিবাদে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংঘর্ষ, সংগ্রাম, রক্তক্ষয়। যোগ্যতমেরই বাঁচার অধিকার এবং বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ— এই দুটি তত্ত্ব এই সংঘর্ষ, সংগ্রাম ও রক্তক্ষয়ের সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলে যায়। মনে রাখা প্রয়োজন, সংগ্রাম, সংঘর্ষ, রক্তক্ষয় কাল প্রবাহের একটি অঙ্গ মাত্র। এগুলি কোনও তত্ত্ব নয়। মানুষকে যদি ভাবতে হয় যে অপরের ক্ষতি এবং বিনাশ করেই তাকে বাঁচতে হবে, তবে মানুষের কাছে শান্তি, ভালোবাসা, প্রীতি এসব কখনোই আশা করা যায় না।

জাতীয়তাবাদে একান্ত ভক্তিমান ইউরোপীয়রা অন্যান্য দেশের জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করে সাম্রাজ্য স্থাপন করল। সেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যখন সংগ্রাম হল তখন তাকেই বলল জাতীয়তাবাদের যুদ্ধ। সেই অঙ্কে, সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে জাতীয়তাবাদ ছিল না, একদম ঠিক তত্ত্ব। ভারতবর্ষে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকেই জাতীয়তাবাদ বলা হল। ভারতের জনগণ, ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুক্ত নয় বলেই জাতীয়তাবাদী হল না। কত সহজ অঙ্কে জাতীয়তাবাদের বিশ্লেষণ ইন্ডিয়ানরা করে দিলেন!

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তা খুব অল্প সময়ের। মোটামুটি ৫০ বছর। তাঁর আগে যে সব বিদেশীরা এদেশে শাসন করতে এসেছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর যুদ্ধটা মোটামুটি ২২০০ বছরের (খৃঃ পূঃ ৩২৩ থেকে)। ওই যুদ্ধগুলিতে কোনও ইন্ডিয়ান অংশ নেয়নি, কারণ ভারতে তখন ইন্ডিয়ানদের জন্ম হয়নি। ভারতে ইন্ডিয়ানদের জন্ম শুরু হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। ১৯৫০ সালে সংবিধানে এই দেশকে

স্বামী বিবেকানন্দ

ইন্ডিয়া হিসাবে পরিচয় দেওয়ার আগে এটি কেবলমাত্র ভারতবর্ষ নামেই পরিচিত ছিল। আর 'ভারত' শব্দের ইংরাজী অনুবাদ 'ইন্ডিয়া' নয়। ইন্ডিয়া এবং ভারত একই দেশের এই দুটি নাম দুটো পৃথক মানসিকতাঁর দ্যোতনা করে। আমরা প্রতিদিন প্রতি সময়ই তাঁর পরিচয় পাচ্ছি। শাসক ইন্ডিয়ানরা ভারতীয়দের কীভাবে উন্নত করবে সেই চিন্তায় ৬০-৬২ বছর বিনিদ্র সময় কাটাচ্ছেন। যখনই একটু বিশ্রাম পাচ্ছেন, তখনই দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করছেন, দুর্নীতি করছেন, আর ভারতীয়দের দয়া করছেন। এঁদের মাথায় মৌলিক ভারতীয় চিন্তা, দর্শন, মনন, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সামান্যই আছে বা নেই। উন্নতি বলতে এঁরা শুধু আর্থিক উন্নতি বোঝেন।

উপনিবেশকারী ইংরেজরা বলল— ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ছিল না, ওঁরাই ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদ শিখিয়েছেন— বিদেশীমনস্ক ভারতীয়রা (ইন্ডিয়ান) বললেন— ঠিক কথা। এ বাবদে আমরা ইংরাজদের কাছে ঋণী। দেশের মনীষীরা এই প্রসঙ্গে কী বলেছেন তা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে থাকল না। ফলে ইংরেজরা যা বলল— সেটাই ধ্রুব সত্য। আমার তো এমন কোনও ইংরেজ বা ইউরোপীয় মনীষার কথা জানা নেই, যাঁদের বা যাঁরা মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের মনীষার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। ভারতীয় প্রাচীন মনীষার সঙ্গে তো এক লাইনে রাখাই যায় না। কিন্তু হীনমন্য ইন্ডিয়ানরা তা বুঝলেন না। তাঁরা বললেন, কালিদাস ইজ দি সেক্সপীয়ার অফ ইন্ডিয়া। অথচ এঁদের বলা উচিত ছিল, সেক্সপীয়ার ইজ দি কালিদাস অফ ইংল্যান্ড। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের ধারণা কোনও প্রতিবাদী বা প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন নয়। এই জাতীয়তাবাদ জন্ম নিয়েছে ভারতের আধ্যাত্মিকতাঁর ভিত্তি থেকে, যার বাহ্যরূপ দেখতে পাওয়া যায় ধর্মে।

ইংরেজরা আমাদের শোনাল যে, ভারতবর্ষ বরাবরই পরাধীন। প্রথমে আর্যরা আক্রমণ করেছিল, পরে পরে আরও অনেক বিদেশী এবং শেষপর্যন্ত ইংরেজ। এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য খৃস্টান মিশনারী ও কমিউনিস্টদের মধ্যে একটি বিষয়ে খুব সাদৃশ্য আছে। (১) ইতিহাস এবং পাণ্ডিত্য দুটোই তাঁরা নিজেদের

উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেছে, (২) তাঁরা সবসময়ই দেশের জনগণকে তাঁদের প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ভারততত্ত্ববিদ বা "Indologist" বলে যাদের বলা হয়, তাঁদের প্রায় সকলেই মিশনারী ঘরানার। আর ভারতের গ্রাহ্য ইতিহাসবিদদের অধিকাংশের আঁতুড়ঘর মার্কসবাদ।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি লর্ড টমাস ব্যাবিংটন মেকলে (১৮০০-১৮৫৮) ভারতে ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন। সেই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল (১) ইংরাজ নামক ভারতীয় সেবাদাস (ইন্ডিয়ান) তৈরি করা, (২) খৃস্টান মানসিকতা তৈরি করা। মেকলে ছিলেন গোঁড়া খৃস্টান পরিবারের। তিনি নিজেই বলেছেন— আমার পরিকল্পনা মতো যদি ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা চলে তবে শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে ৩০ বছরের মধ্যে মূর্তিপূজক কেউ থাকবে না। (মেকলে, দি শেপিং অফ দি হিস্টোরিয়ান - জন ক্লাইভ, পৃঃ ৪১২-৪১৬)। তাঁর এই উদ্দেশ্যসাধনে তিনি এমন একজনকে চাইছিলেন যিনি ভারতীয় শাস্ত্রের এমন ব্যাখ্যা করবেন, যাতে ভারতীয়রা শাস্ত্র ত্যাগ করে নিউ টেস্টামেন্টের দিকে যায়। চেহারায় ভারতীয় থাকলেও মানসিকতায় ইংরেজদের দাস হবে। প্রথমে তিনি হোরেস হেম্যান উইলসনকে ধরেন। উইলসন নিজে রাজি না হলে ফ্রেডেরিক ম্যাক্সমুলার (১৮২৩-১৯০১)-কে এগিয়ে দেন। মুলারের বয়স তখন ৩১। ১৮৫৪ সালের ডিসেম্বরের ১ লক্ষ টাকা পাওয়ার চুক্তিতে মুলার দায়িত্ব নেন।

ম্যাক্সমুলার ছিলেন গোঁড়া খৃস্টান। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, ৪০০৪ খৃস্টপূর্বাব্দে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে। ফলে ওই সময়ের আগে ভারতবর্ষ নামে একটি দেশ থাকা এবং তাঁর সুসভ্য ও সুসংহত জীবনবোধ থাকা— মুলারের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিরোধী।

মুলার এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, ভারতবর্ষে পদার্পণ না করেই ওই ৩১ বছর বয়সে বেদ সম্পর্কে যা লিখলেন, তাই-ই প্রচারিত হল এবং প্রচারের দৌলতে সত্য বলে বিশ্বাস করা হল। এঁর পিছনে ছিল সরকারি পরিকল্পনা। মুলার তাই বললেন— "আমার এই পুস্তক —'দি সেক্রেড বুক অফ দি ইস্ট' ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলবে। তাঁদের ধর্মের মূলটা কোথায় তাঁরা তা জানতে পারবে। গত তিন হাজার বছর ধরে তাঁরা যা বিশ্বাস করে চলেছে, সেই বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করার এইটাই একমাত্র উপায় বলে আমি মনে করি" (Max Mular, F. 1902, Life and letters, Edited by Georgina Mullar, P-328)।

১৮৬৮ সালে তিনি সেক্রেটারি অফ স্টেটস্ ফর ইন্ডিয়া— ডিউক অফ আরগিলকে লিখলেন, "ভারতের প্রাচীন ধর্মের শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে, এঁরপর যদি খৃস্ট ধর্ম সে স্থান দখল করতে না পারে, সেটা কার দোষ?" (একই পুস্তক, পৃঃ ৩৫৭-৩৫৮)

ম্যাক্স মুলারের গোপন উদ্দেশ্য এইভাবে বোঝা গেল। তিনি পরবর্তীকালে নিজের মত পাল্টেছিলেন বটে, কিন্তু ততদিনে যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে। ১৮৭১ সালে মুলার তাঁর তত্ত্ব পাল্টালেন। স্বীকার করলেন, 'আর্য' কোন জাতিবাচক শব্দ নয়। জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতায় তিনি বললেন যে, আর্য বলতে জাতিগোষ্ঠী বোঝায় না, ভাষা গোষ্ঠী বোঝায়— এই ভাষা গোষ্ঠীতে সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, আবেস্তা এবং অন্যান্য আছে। (Max Mullar : Biographics of Words and Home of Aryans, P-26)।

ম্যাক্সমুলার এবং এই ধরনের পণ্ডিতরা যখন এই আর্য আক্রমণ তত্ত্ব বাজারে চালু করলেন, তখন আর্কিওলজি বা প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যার জন্মই হয়নি। তাই সাল তারিখ পুরোটাই মনগড়া— কাল্পনিক। মুলারের তত্ত্বের মূল ভিত্তি ছিল ভাষাতত্ত্ব, এবং সেই ভাষাতত্ত্বও তখন অতি নাবালক অবস্থায়।

মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন হয়েছে ১৯২১-২২ সালে। অর্থাৎ মুলারের আর্য আক্রমণ তত্ত্ব তৈরি হওয়ার অন্তত ৬০-৭০ বছর পরে। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ-নথি আর্য আক্রমণ তত্ত্ব সমর্থন করল না। কোনও কোনও পণ্ডিত খোলাখুলিই বললেন, আর্য আক্রমণ তত্ত্ব একটি অলীক কল্পনা— ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবেই ভারতের নিজস্ব (J G Shaffer : Indo-Euro-

বিগত দুই শতাব্দীর পূর্বে রচিত কোনও শাস্ত্র, সাহিত্যে, ইতিহাসে আমরা একথা পাই না যে, সব ধর্মই সমান। হিন্দুদের কোনও শাস্ত্রেই এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। বেদ, ষড়দর্শন, উপনিষদ, পুরাণাদি, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদিতে 'সব ধর্মই এক' এই তত্ত্বের সমর্থন পাওয়া যায় না। ব্যাস, পতঞ্জলি, কপিল, শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য, বল্লভ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ কেউই এ ধরনের কথা বলেননি।

pean Invasion, P-88)।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে যে সব তথ্য পাওয়া গেল, তাঁর সঙ্গে আর্য আক্রমণ তত্ত্ব বলে যেটি প্রায় ৬০-৭০ বছর আগে প্রচারিত হয়েছিল, তাঁর কোনও মিল পাওয়া গেল না। তখন কেঁচেগণ্ডুষ করে আবার নতুন তত্ত্ব তৈরি করতে হয়। কিন্তু করবে কেন? কেঁচেগণ্ডুষ করলে যা দাঁড়াবে, তা তাঁদের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বিরোধী হয়ে যাবে। তখন একমাত্র রাস্তা ছিল গোঁজামিল দেওয়া। প্রচারিত তত্ত্বের সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে খাপ খাইয়ে দাও। গোঁজামিল করার পর যা দাঁড়াল তা হল— অসভ্য, বর্বর আর্যরা মধ্য এশিয়া বা অন্য কোনও অঞ্চল থেকে এসে ভারতবর্ষের সুসভ্য হরপ্পা সভ্যতা বা সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস করেছিল। তাঁদের অত্যাচারে অত্যাচারিত দ্রাবিড়রা দক্ষিণ ভারতে পারিয়ে গেল। সেই অসভ্য, বর্বর আর্যদের কোনও ইতিহাস পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল বিশাল সাহিত্য সম্ভার। আবার সুসভ্য হরপ্পা বা সিন্ধু সভ্যতাঁর বিশাল ইতিহাস পাওয়া গেল বটে, কিন্তু এক লাইনেরও কোনও সাহিত্য পাওয়া গেল না।

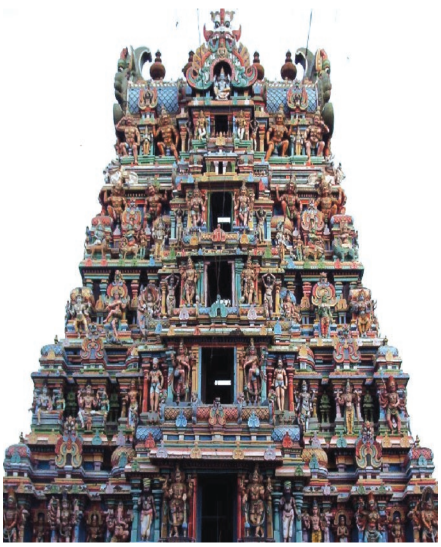

মীনাক্ষী মন্দির

বিগত দেড়শত বছরে শুধু ইতিহাসের বিকৃতি এবং গোঁজামিল হল তাই নয়— ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্বেও গোঁজামিল হল। তৈরি হল যত মত, তত পথ তত্ত্ব। সব ধর্মই এক— এই বুলি।

প্রকৃত প্রস্তাবে সব ধর্ম কোনও কালেই এক ছিল না। এখনও নয়। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই যে, সব ধর্মই এক ঈশ্বরেরই আরাধনা করে, তাহলেও একথা ঠিক নয় যে, সব ধর্মই এক। একটি উদাহরণ : সমস্ত রাজনৈতিক দলই জনসাধারণের কল্যাণের কথা বলে। আমরা কি এই ভিত্তিতে বলতে পারি যে, সব রাজনৈতিক দলই এক? বলতে পারি না, কারণ প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই নিজস্ব মতাদর্শ আছে এবং তা রূপায়ণের পথ ও পদ্ধতি আছে। এই মতাদর্শ ও পথ-পদ্ধতি এক নয়। তাহলে তালিবানপন্থী কোনও জঙ্গী দল এবং জাতীয় কংগ্রেস একই বলতে হয়। উভয় দলই জনকল্যাণের কথা বলে। মাওবাদী দল ও তৃণমূল কংগ্রেস কি এক? যেহেতু উভয়েই মানুষের কল্যাণের কথা বলে। সি পি আই (এম) এবং বিজেপি কি এক, যেহেতু উভয় দলই মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের কথা বলে?

যে জন্য বা যে কারণে সব রাজনৈতিক দল এক নয়, ঠিক সেই জন্য এবং সেই কারণে সব ধর্মই এক নয়। জল, পানি, ওয়াটার (কংগ্রেস, বিজেপি, সি পি এম, মাওবাদী) সবই H_2O (জনকল্যাণের কথা বলে)। কিন্তু সব H_2O যেমন গ্রহণীয় নয়, সব দলই এক সঙ্গে সমর্থনযোগ্য নয়।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়গুলির (খৃস্টান, ইসলাম ইত্যাদি) কোনওটিই — 'সর্বধর্ম এক' একথা বিশ্বাস করে না। মানে না। তাঁরা ঠিকই করে। তাঁদের মতে, তাঁদেরটাই ঠিক, অন্যগুলি ঠিক নয়। শুধু ঠিক নয় নয়— সেগুলিকে শেষ করে দেওয়া দরকার।

খুব বিচক্ষণতাঁর সঙ্গে হিসাব করলে বলা যায়, প্রায় দেড়শত বছর ধরে মাত্র এই কথাটা বলা হচ্ছে যে, — সব ধর্মই এক। বলছেন কেবলমাত্র হিন্দুরা। বিনা চিন্তায়, বিনা অধ্যয়নে হিন্দু পিতামাতা, হিন্দু গুরু, হিন্দু স্বামীজীরা এইসব বলছেন। এঁরা কেউই অন্যান্য ধর্ম বা রিলিজিয়ন সম্পর্কে আদৌ অবহিত নন। দীর্ঘ দেড় শতাব্দী ধরে এই প্রচার হিন্দু সমাজ ও হিন্দুত্বের মূলে আঘাত করছে। হিন্দু এবং হিন্দুত্ব এখন অন্যান্য ধর্ম এবং রিলিজিয়নের শিকার। হিন্দু ভোটে নির্বাচিত সরকারও হিন্দু-বিরোধিতায় তৎপর।

সব ধর্মে ঈশ্বর তত্ত্ব বা চরম সত্য বা ব্রহ্ম তত্ত্ব এক নয়। এই ক্ষেত্রে সনাতন হিন্দুবাদীদের তত্ত্ব অন্যরা সামান্যও স্বীকার করে না।

বিগত দুই শতাব্দীর পূর্বে রচিত কোনও শাস্ত্র, সাহিত্যে, ইতিহাসে আমরা একথা পাই না যে, সব ধর্মই সমান। হিন্দুদের কোনও শাস্ত্রেই এঁর প্রমাণ পাওয়া যায় না। বেদ, ষড়দর্শন, উপনিষদ, পুরাণাদি, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদিতে 'সব ধর্মই এক' এই তত্ত্বের সমর্থন পাওয়া যায় না। ব্যাস, পতঞ্জলি, কপিল, শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য, বল্লভ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ কেউই এ ধরনের কথা বলেননি।

যারা বেদকে মানে তাঁরা হিন্দু, যারা বেদ মানে না— তাঁরা অহিন্দু।

এখানে বেদ অর্থে সমগ্র বৈদিক সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি বুঝতে হবে। বেদ মানলে বৈদিক, বেদ না মানলে অবৈদিক। বৈদিকরা আস্তিক, অবৈদিকরা নাস্তিক।

খৃস্ট ও ইসলাম প্রবর্তিত হওয়ার অনেক আগেই অবৈদিক কারা তা যথার্থ ভাবে সনাক্ত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক সম্প্রদায় অবৈদিক হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল।

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগিং যম মাতরিশ্বান মাহুঃ।"

এই বৈদিক মন্ত্র যখন উচ্চারিত হয়, তখন খৃস্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদির উৎপত্তি হয়নি। সত্য বা ঈশ্বর এক, যদিও

বিপ্রগণ তাকে বহু নামে ডাকেন। যেমন অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা। এখানে বহু নাম বলতে গড, আল্লা, জিহোভা বোঝাচ্ছে না। আর তখন ওইসব ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্মও হয়নি, শাস্ত্রও রচিত হয়নি। ঈশ্বরের সত্তাতাত্ত্বিক (ontological) বিষয়ে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে অন্য কোনও সম্প্রদায়ের কোনও সামান্য মিলও নেই।

সর্ব ধর্ম সমান-বাদীরা ঈশ্বর লাভের উপায় এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান — (Soteriological, Epistemological) বিষয় দুটিকে ঈশ্বর সত্তাতাত্ত্বিকতাঁর (ontological) সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন।

সব ধর্ম সমান— একথা হিন্দু শাস্ত্রে কোনওকালেই বলা হয়নি। বিগত দেড়শ বছরের মধ্যে এই তত্ত্ব জন্মলাভ করেছে এবং হিন্দুদের আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিলুপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে একমাত্র ভারতবর্ষই হিন্দু প্রধান দেশ। সেই কারণে একমাত্র ভারতেই সমস্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্মীয় অত্যাচার থেকে মুক্ত আছেন। ইন্ডিয়ানরা জ্ঞাতসারে এবং কোনও কোনও ধর্মীয় সংগঠন ও স্বামীজী মহারাজরা ভারতীয়দের আত্মবিস্মৃত ও আত্মবিলুপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।

সর্ব ধর্ম সমান— এই তত্ত্ব অসার এবং অসত্য। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন— গর্ব করে বল আমি হিন্দু। সব ধর্ম সমান— এই তত্ত্ব অন্য কোনও সম্প্রদায় মানে না ও বিশ্বাস করে না। হিন্দুদেরও তা মানবার ও বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই। হিন্দুবাদ এবং হিন্দুত্ব রক্ষা করাই ভারতীয়দের কর্তব্য। এবাবদে ইন্ডিয়ানদের বিরোধিতা স্বাভাবিক। তাই তাঁদের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দেওয়া ঠিক পথ নয়।

একাত্ম মানববাদে একমাত্র ভারতীয় হিন্দুরাই বিশ্বাস রাখে। এই একাত্ম মানববাদই পৃথিবীকে রাস্তা দেখাবে। আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি বলে যদি কিছু থাকে, তবে তাতে ভারতের অবদান এই একাত্ম মানববাদ। যা হিন্দুবাদ ও হিন্দুত্বের মূল সুর।

সম্পূর্ণ দেশ ও জাতিকে যারা আজকে ভুল পথে চালাচ্ছে, প্রতিনিয়ত আত্মবিস্মৃত হতে শিক্ষা দিচ্ছে, তাঁদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। তাঁদের সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। ভারতের বাইরে ভারতীয়দের থাকবার স্থান নেই। তাই ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষই রাখতে হবে, ইন্ডিয়া করলে চলবে না।

বাঙালি হিন্দুর মূল্যবোধ

তথাগত রায়

এ বিষয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় মানুষের জীবনের চলার পথে মূল্যবোধ— ইংরাজিতে 'সেন্স অফ ভ্যাল্যু' বা 'ভ্যাল্যু সিস্টেম'— এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু নেই। মূল্যবোধ ব্যাপারটা তৈরি শুরু হয় শৈশবেই এবং সম্ভবত তের-চোদ্দ বছর বয়সের মধ্যে এই প্রক্রিয়ার সিংহভাগটা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। তার পরে যে মূল্যবোধ বদলায় না তা নয়, কিন্তু মৌলিক বদল কমই হয়, এবং ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই হয়।

মূল্যবোধ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? তার কারণ, মূল্যবোধ ঔচিত্য-অনৌচিত্যবোধ শেখায় এবং এই ঔচিত্য-অনৌচিত্যবোধই মানুষের বিবেক তৈরি করে। মূল্যবোধ কালভেদে, স্থানভেদে এবং পরিস্থিতিভেদে বিভিন্ন রকমের হয়, কিন্তু দেখা যায়, একটি সময়ের একটি আর্থ-সামাজিক স্তরের মানুষের মূল্যবোধ মোটামুটি একই রকমের হয়। দেশভেদে মূল্য-বোধের আমূল প্রভেদ সৃষ্টি হয়, কাল-ভেদে একই দেশের একই আর্থ-সামাজিক স্তরের মানুষেরও আমূল পার্থক্য হতে পারে। এই মূল্যবোধ মানুষ পায় মূলত বাবা-মার এবং শিক্ষা-গুরুদের কাছ থেকে এবং অংশত সমবয়স্কদের কাছ থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই মূল্যবোধকে অনেক সময় 'সংস্কৃতি' বা কালচার বলা হয়ে থাকে, যদিও 'সংস্কৃতি' জিনিসটার ব্যাপ্তি আর একটু বেশি। তাছাড়া, সংস্কৃতি একটি জনসমষ্টির প্রতি প্রযোজ্য, কিন্তু মূল্যবোধ জনসমষ্টির প্রতি যেমন প্রযোজ্য হতে পারে তেমনি ব্যক্তির প্রতিও প্রযোজ্য হতে পারে।

এই স্থানভেদ, কালভেদ, পরিস্থিতিভেদ বোঝাতে কিছু উদাহরণ প্রয়োজন। সাধারণত আমরা পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত বাঙালিরা পরস্পরের সঙ্গে যেভাবে কথা বলি এবং অপরিচিত মানুষের সঙ্গে যে ব্যবহার করি, তার থেকে (উদাহরণস্বরূপ) হরিয়ানার জাঠদের কথা বলার ভঙ্গী বা ব্যবহার অনেকটাই পৃথক, আমাদের চোখে এবং কানে ওই ধরনের ব্যবহার 'অভদ্র' বা 'চাষাড়ে' মনে হবে। হরিয়ানাতেও জাঠ এবং বানিয়া সম্প্রদায়ের মানুষের আবার ব্যবহারের মধ্যে প্রচুর প্রভেদ আছে। আজকে যদি কোনও বাঙালি অন্য কোনও বাঙালির কাছে এক গ্লাস জল খাবার আগে জলদাতার জাত জিজ্ঞসা করেন, তাহলে তাকে 'ইতর' অথবা 'আধাপাগল রক্ষণশীল' বলব— কিন্তু ত্রিশের দশক বা তার আগে এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ছিল। তখন তথাকথিত 'ছোট জাত'-এর মধ্যে আবার 'জল-চল' এবং 'জল-অচল'-এর পার্থক্য করা হত— যাদের কাছ থেকে তথাকথিত 'উচ্চবর্ণ'রা যথাক্রমে জল খেতে পারেন এবং পারেন না। এই মনোভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই রবীন্দ্রনাথ চণ্ডালিকায় লিখেছিলেন, ''যেই মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা / সেই বারি তীর্থবারি যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে / যাহা তাপিত জনেরে স্নিগ্ধ করে / সেই তো পবিত্র বারি।''

পরিস্থিতি ভেদে মূল্যবোধের প্রভেদের একটা অত্যন্ত করুণ উদাহরণ মনে

> মার্কসবাদের স্থান আজকে সারা পৃথিবীতে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে, গত চৌত্রিশ বছরে বামপন্থী শাসন থেকে বাঙালি বুঝে গিয়েছে, বামপন্থা কি জিনিস। কিন্তু তবু বাঙালির মন থেকে এর সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব যায়নি। বর্তমানে যে দিদিতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গে চলছে তা কোনও নীতিভিত্তিক নয়, কিন্তু বামপন্থা থেকে খুব আলাদাও কিছু নয়।

পড়ছে। পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩)-এর সময় যখন পনের দিন না খেতে পাওয়া শিশু কোলে মাতা লঙ্গরখানায় খেতে পেলেন তখন শিশুকে সরিয়ে মা নিজে খাচ্ছেন, শিশুটি মায়ের হাত থেকে খাবার জন্য আকুলিবিকুলি করছে। এমন দৃশ্যও দেখা গেছে— স্বাভাবিক অবস্থায় দরিদ্রতম মা-ও যা কল্পনা করতে পারেন না। যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে পঞ্চাশের মন্বন্তরের সূত্রপাত হয়েছিল, সেই ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসের কাঁথি-তমলুকের বন্যায় সরকার সাধারণ মানুষের উপর যে অত্যাচার করেছিল, তার কোনও তুলনা নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, যারা অত্যাচার করেছিল

বাঙালি হিন্দু কুতুবুদ্দিনকে আশ্রয় দিয়ে প্রগতিশীল সাজে।

তারা কি বৃটিশ ছিল? না, তারা ভারতীয়ই ছিল এবং তারা অবস্থার চাপে উপরওয়ালার হুকুম মেনে এই সব কুকীর্তি করেছিল যা তারা আজকে মনেও আনতে চাইবে না। একই ধরনের কুকীর্তি আমরা দেখেছি পশ্চিমবাংলায় সি পি এম আমলে পুলিশের কাজে এবং এখনও দেখছি 'দিদি'র পুলিশের কাজে। যে সব পুলিশ এই সব কাজ করে তারা কি পারিবারিক জীবনেও একই রকমভাবে মানুষের উপর অত্যাচার করে?

মূল্যবোধ (যা আমাদের চোখে আজকে বিকৃতির চরম অবস্থা বলে মনে হতে পারে) তা মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, তার তিনটি উদাহরণ দিয়ে সাধারণ মূল্যবোধের আলোচনায় ইতি টানব— কারণ এই নিবন্ধের বিষয় সাধারণ মূল্যবোধ সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা নয়, বিষয় বিশেষভাবে হিন্দু-বাঙালির মূল্যবোধ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক পর্যন্ত জাপানে 'সামুরাই' (যোদ্ধা) সম্প্রদায়ের কেউ কোনও লজ্জাজনক কাজ করলে (যেমন যুদ্ধে হেরে যাওয়া বা ছেলেমেয়েকে ঠিকঠাক শিক্ষা দিতে না পারা) তার অবশ্যকর্তব্য ছিল 'সেমুকু' বা 'হারাকিরি'— এক নারকীয় উপায়ে আত্মহত্যা, যাতে নিজের পেটের মধ্যে নিজের তলোয়ার ঢুকিয়ে দিয়ে নিজের নাড়িভুঁড়ি ছত্রখান করে দেওয়া হয়। এই অবস্থায়ও একজন মানুষের মরতে সময় লাগে বলে তার একজন সাহায্যকারী থাকে যে তার মুণ্ডুচ্ছেদ করে। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, নিজের পেটে তলোয়ার ঢুকিয়ে দেবার আগে একটি ছোট কবিতা (হাইকু) রচনা করা সেমুকুকারীর অবশ্যকর্তব্য।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু দক্ষিণী রাজ্যে (যেমন মিসিসিপি, আলাবামা প্রভৃতি) আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মার্কিনদের জন্য সাদাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং নিকৃষ্টতর ব্যবস্থা ছিল। মার্টিন লুথার কিং থেকে আরম্ভ করে আরও বহু সাদা এবং কৃষ্ণাঙ্গ এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। এর একটি বিচিত্র উদাহরণ— যা মার্কিন দেশেরই 'লাইফ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, একটি বাস স্টেশনের একটি ছবি, যাতে পাশাপাশি তিনটি শৌচালয়ের দরজা দেখানো। এই দরজাগুলির উপরে লেখা :Men, "Women", "Colored"। অর্থাৎ "Colored" বা 'রঙীন' যারা, যারা সাদা নয়, তারা পুরুষ বা স্ত্রীলোক কোনও পর্যায়েই পড়ে না, অতএব তাদের শৌচালয়ে স্ত্রী-পুরুষ প্রভেদ করার প্রয়োজন নেই।

মেরু অঞ্চলের অধিবাসী এস্কিমো (আজকাল এঁদের 'এস্কিমো' না বলে 'ইনুইট' বলা হয়) বুড়ো হলে তার ছেলেরা তাদের বরফের উপর রেখে আসে এবং বলে দেয়, কম্বল-টম্বল মুড়ি দিও না, তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। বেশিক্ষণ কষ্ট পাবে না।

এবার বাঙালি হিন্দুর মূল্যবোধ প্রসঙ্গে আসি। প্রথম কথা, বাঙালির মূল্যবোধ সম্বন্ধে না লিখে বাঙালি হিন্দু লিখছি কেন? এর কারণ, বাঙালি হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি এবং সখ্যতা যতই কাম্য হোক, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের সমাজব্যবস্থা এক নয়, রাজনীতি এক নয়, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এক নয়, এমন কি ভাষা পর্যন্ত পুরোপুরি এক নয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দু'দলের সম্বন্ধ আলোচনা আলাদা করে না করা গুরুতর ভুল হবে।

বাংলা বাদে ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলের হিন্দু মানুষের মূল্যবোধ অনেকাংশে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু হিন্দু ধর্ম কোনও Codified, এক-পুস্তক এক-গুরু নির্ভর ধর্ম নয়, সেইজন্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন হিন্দু দেবতা (লৌকিক দেবতা সমেত) প্রাধান্য পেয়েছেন, কিন্তু সব কিছুর মধ্যে হিন্দু ভাবটা অটুট থেকেছে। যেমন — হিন্দিবলয়ে, অর্থাৎ বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের হিন্দুদের মধ্যে রাম এবং হনুমান

আরাধ্য দেবতা, এর সঙ্গে গো-মাতার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। অসমে শঙ্করদেব প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য, ওড়িশায় প্রধান আরাধ্য দেবতা প্রভু জগন্নাথ, দক্ষিণ ভারতে প্রভু ভেঙ্কটেশ্বর, প্রভু আয়াপ্পা, প্রভু মঞ্জুনাথ ইত্যাদি। মহারাষ্ট্রে প্রধান আরাধ্য দেবতা সিদ্ধিদাতা গণেশ, গুজরাটে রাধাকৃষ্ণ। কিন্তু সব অঞ্চলের হিন্দুরাই হাত জোড় করে প্রণাম করেন, বিভিন্ন দেবতার উৎসব পালন করেন, সেখানে ঢাকঢোল বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়, ধূপধুনো দেওয়া হয়, সংস্কৃত মন্ত্র পড়েন ব্রাহ্মণরা, ভোগ হয় ইত্যাদি। বছরের পর বছর ধরে কপর্দকশূন্য অবস্থায় পুরো ভারত পরিব্রাজন করে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, ভারতবাসী ধর্মের মধ্যে দিয়ে ছাড়া কিছু বুঝতে পারে না, ভারতবাসীর হৃদয় থেকে ধর্মকে উৎপাটন করার চেষ্টা গঙ্গাকে সাগর থেকে হিমালয়ে ঠেলে তুলে অন্য খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টার মতোই নিষ্ফল।

কিন্তু স্বামীজীর নিজের দেশ বাংলার কি অবস্থা?

ভারতের সমস্ত হিন্দুর মধ্যে বাঙালিদের মধ্যে ধর্মের বাঁধন বোধ হয় শিথিলতম। বাঙালিদেরও আরাধ্যা আছেন— মা কালী এবং মা দুর্গা, কিন্তু অন্য অঞ্চলের হিন্দুর চোখে তাঁদের আরাধ্য বা আরাধ্যারা যে জায়গা নিয়ে আছেন সে জায়গা বাঙালির চোখে বা হৃদয়ে মা কালী বা মা দুর্গার নেই। এক সময় বাঙালির ঘরে ঘরে লক্ষ্মীঠাকুর শোভা পেতেন, অবস্থাপন্ন মানুষের বাড়িতে একটা ঠাকুরঘরও থাকত, আজ তা নেই। আজকে বাঙালি হিন্দু কেবল বিপদে পড়লে কালীঘাটে দৌড়ায়, আর দুর্গাপুজোর সময় 'মোচ্ছব' করে ('সেকুলার' বাহিনী— এঁদের কথা পরে— তো সর্বদাই প্রমাণ করতে সচেষ্ট যে দুর্গাপুজো একটা সামাজিক অনুষ্ঠান, এর সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক সামান্যই)।

ভারতের অন্য অঞ্চলের মানুষের ধর্মবিশ্বাস তাদের যে মূল্যবোধের জন্ম দিয়েছে, বাঙালি হিন্দুর ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তামাশা করা (বিশেষ করে স্থানীয় আরাধ্য দেবতা নিয়ে) ভারতের অন্য জায়গার হিন্দুর মধ্যে কল্পনাতীত, কিন্তু বাঙালি হিন্দু এই জিনিস আকছার করে থাকে। এবং করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকে। এই ধর্মবিশ্বাসের মূল ছিঁড়ে যাবার ফলে বাঙালি হিন্দুর এক হালভাঙা পালছেঁড়া নৌকোর মতো দশা হয়েছে। এই দশার সম্যক চেহারাটা কিরম, কেন এই দশা হয়েছে এবং এর থেকে উত্তরণের উপায় কি তা খুব সংক্ষেপে এই নিবন্ধে আলোচনা করা হবে।

এই লেখকের পিতৃপ্রতিম, রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য প্রমথনাথ বিশী শান্তিনিকেতনে পড়াকালীন একটি পাঁচ লাইনের কবিতা রচনা করেছিলেন, যার মধ্যে শিশুর সারল্য ও বাঙালির ক্ষীয়মান ধর্ম বিশ্বাসের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়— ''হরি হে, হে দয়াময় / কিছু মার্ক দিও আমায় /তোমার শরণাগত / নহি সতত/ শুধু এই পরীক্ষার সময়।'' আজকের বাঙালি নব্যযুবা নিজেদের 'সেকুলার' বা নাস্তিক বলতে গর্ববোধ করে, পুজোর প্যান্ডেলে বসে মদ্যপান করে (আবার মনে মনে সেটাকে কালীভক্ত বামমার্গী চিন্তা দিয়ে জাস্টিফাই করে), কেউ কেউ গো-মাংসও খায়। কিন্তু ওই যে বললাম— বিপদে পড়লে কালীঘাটে দৌড়ায়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী, মেয়েদের শিবপূজা নিয়ে অশ্লীল ইঙ্গিত করতে এদের বাধে না। অথচ একটা আশ্চর্য জিনিস, কিছু গলিতে দেখা গেছে, যেখানে লম্বা দেওয়াল আছে, সেখানে দেওয়ালের মালিক মাঝে মাঝেই ঠাকুরদেবতার ছবি লাগিয়ে রাখেন। এবং ফলে সেখানে কেউ মূত্রত্যাগ করে না, ঠাকুরের ছবি না থাকলে যা করত।

এর ফলে যা হয়েছে তার ইংরিজি নাম confusion। মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালি উচিত-অনুচিত জানে না, নিজের ছেলেমেয়েদেরও জানাতে পারে না। পরীক্ষায় প্রথম হবার উচ্চাশা নিশ্চয়ই ভাল, কিন্তু সেই উচ্চাশা পূরণ করতে গিয়ে কতদূর যাওয়া যাবে, ছলনার আশ্রয় নেওয়া যাবে কিনা, এসব কথা বেশিরভাগ বাবা-মাই বাচ্চাদের শেখান না। নিজের কেরিয়ার তৈরি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ— ছেলেদের এবং মেয়েদের দুয়ের ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তা করতে গিয়ে যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কাজ করেন সেখান সাধারণ সংসারযাত্রার সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্য রাখা যাবে তা নিয়ে আজ প্রতি সংসারে অশান্তি এবং প্রায়ই এই অশান্তির শিকার হচ্ছে বাচ্চারা। এর মূল কারণ, মূল্যবোধ পরিষ্কার নয়।

বাঙালি হিন্দুর মূল্যবোধের সামগ্রিক বিকৃতির একটি জায়গা মুসলমান সম্বন্ধে তাদের মানসিকতা। মুসলমানরা আমাদের দেশের অবশ্যই সম্মানিত নাগরিক— কিন্তু তারা অন্যায় করলে সেটাকে অন্যায় বলা যাবে না, বললে সমাজে পতিত হতে হবে, এই রকম একটা মানসিকতা মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুর মনে প্রোথিত হয়ে গেছে। এর ফলে কি সর্বনাশ আগামী দিনে হতে যাচ্ছে তা আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যের অসমীয়া হিন্দুদের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে।

এই মূল্যবোধ নষ্ট হওয়া এবং জীবনে ধর্মের স্থান নষ্ট হওয়ার মূল কারণ অবশ্যই বামপন্থা। মার্কসবাদ বা কমিউনিজমও বলা যায়। ত্রিশের দশক থেকে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা বাঙালি হিন্দুর মনে এই তত্ত্বের চাষ করে আসার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা বিচিত্র! তার সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, বামপন্থীদের এই 'চাষ' প্রতিহত করার জন্য কোনও চেষ্টা কোনও মহল থেকেই করা হয়নি। মার্কসবাদের স্থান আজকে সারা পৃথিবীতে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে, গত চৌত্রিশ বছরে বামপন্থী শাসন থেকে বাঙালি বুঝে গিয়েছে, বামপন্থা কি জিনিস। কিন্তু তবু বাঙালির মন থেকে এর সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব যায়নি। বর্তমানে যে দিদিতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গে চলছে তা কোনও নীতিভিত্তিক নয়, কিন্তু বামপন্থা থেকে খুব আলাদাও কিছু নয়। মমতা একাধিকবার বলেছেন, ''আমরা বাম-বিরোধী নই, বামফ্রন্ট- বিরোধী।''

এর থেকে বাঙালির মূল্যবোধের সবচেয়ে বড় বিকৃতি হয়েছে। বাঙালি মনে মনে ধনবান হতে চায়। কিন্তু ধনের জন্য খাটা, বা খেটে উপার্জন করাকে প্রকাশ্যে নিন্দা করে। ধনী মানুষকে বাঙালি হিন্দু ঈর্ষা করে। কিন্তু সম্মান করে না, অন্তত প্রকাশ্যে করে না। টাটা-বিড়লা-আম্বানী— এই কথাগুলি বাঙালির কাছে অশ্রদ্ধাবাচক, কিন্তু নিজে হতে পারলে কারুর বিন্দুমাত্র আপত্তি হবে বলে মনে হয় না। এই মানসিকতা যে জাতির আছে, তার পক্ষে কোনও অর্থনৈতিক উন্নতির আশা করা দুরাশা। অর্থকে যদি প্রকাশ্যে সম্মান না করা যায়, অর্থোপার্জনের সৎ চেষ্টাকে যদি প্রশংসা না করা যায়, মনে মনে যদি 'ফোকটে' অর্থাগমের প্রভূত ইচ্ছা থাকে, তাহলে সারা জীবনই এই দ্বিচারিতার মধ্যে কেটে যাবে। এদিকে লুকিয়ে লুকিয়ে (বা প্রকাশ্যেই) লটারির টিকিট, বিশেষত 'অনলাইন লটারি', এক-সংখ্যার লটারি, চিটফান্ড ইত্যাদিতে পয়সা নষ্ট হবে।

হিন্দু ধর্ম আমাদের শিখিয়েছে, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ — এই চার পুরুষার্থকে অনুসরণ করতে। এগুলির মধ্যে ভারসাম্য রেখে চলার মূল্যবোধই সঠিক মূল্যবোধ। মার্কসবাদী জঞ্জাল মন থেকে দূর করতেই হবে, নিজের ধর্ম, নিজের আরাধ্য দেবদেবীকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা করতেই হবে। ধর্মবিশ্বাস অটুট রাখার জন্য ন্যূনতম পূজার্চনা— প্রত্যেকের নিজের মতো করে, এবং সম্ভব হলে সামূহিক ভাবেও করতে হবে। অন্যের ক্ষতি না করে অর্থোপার্জন (মার্কসবাদী 'শোষণ'-এর ধারণা বর্জন করে) যে তাচ্ছিল্যের নয়, সম্মানের জিনিস, এই ধারণা তৈরি করতেই হবে। 'মুসলমানের অন্যায় নিয়ে কিছু বলা চলবে না'— এই ধারণা বর্জন করতেই হবে, অন্যায় দেখলে তাকে অন্যায় বলতেই হবে। এই পথেই উত্তরণ সম্ভব। না হলে বাঙালি হিন্দুর জাতি হিসেবে বিলুপ্ত হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা।

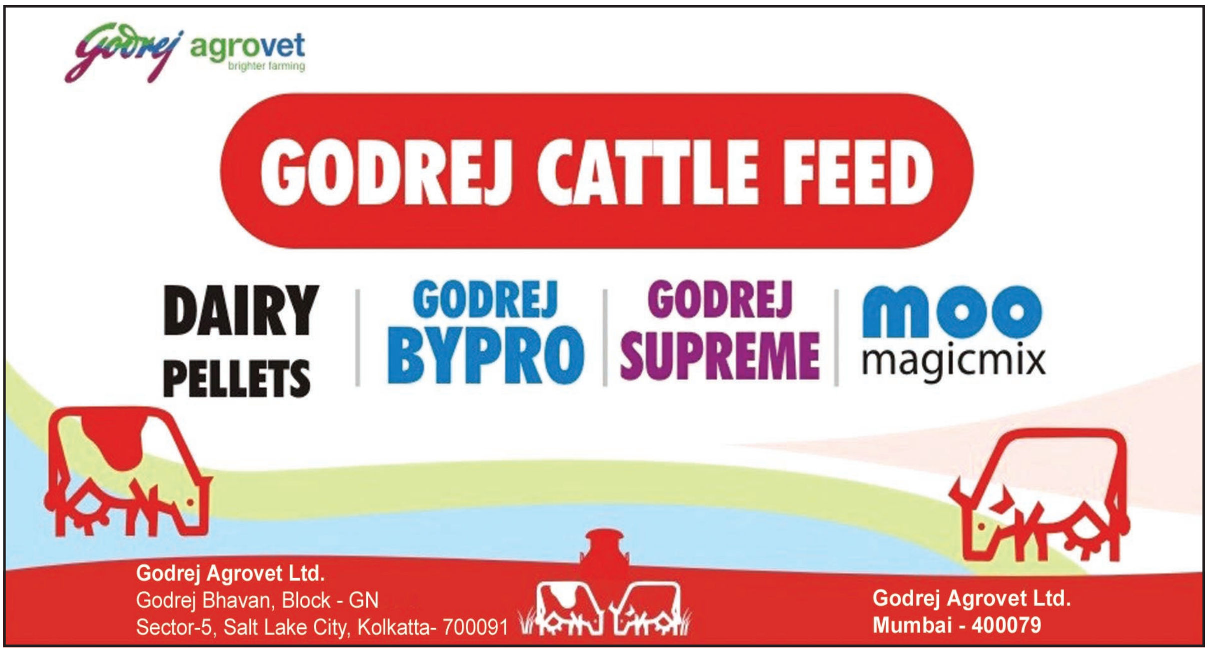

চিত্র : ১

আজকের লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি নয়

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

আজকের তথাকথিত সেকুলারবাদী ঐতিহাসিকদের মতে আগ্রার তাজমহল ও দিল্লীর লালকেল্লার নির্মাতা হল মোগল সম্রাট শাহজাহান। আগ্রার তাজমহল যে শাহজাহানের তৈরি নয়, তা এই লেখকের 'মিথ্যার আবরণে দিল্লী, আগ্রা ফতোপুরসিক্রি' গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

যাই হোক, শাহজাহান ১৫৯২ খৃষ্টাব্দের ৫ জানুয়ারি, লাহোরে জন্মগ্রহণ করে এবং ১৬৬৬ সালের ২২ জানুয়ারি আগ্রায় মারা যান। বাবর, হুমায়ুন এবং আকবরের পর পঞ্চম মোগল সম্রাট হিসাবে তিনি দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন। তাঁর মাতা ছিলেন একজন রাজপুত রমণী, নাম জগতগোসাই। শাহজাহানের প্রকৃত নাম ছিল খুররম (পার্শী ভাষায় যার অর্থ হল আনন্দোচ্ছল)। পিতামহ আকবর এই নামকরণ করেন। পরে মেবার, কাংরা ও দাক্ষিণাত্যে সফল যুদ্ধ পরিচালনা করে শাহজাহান নিজেকে একজন সামরিক নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। পিতা জাহাঙ্গীরের আমলে তিনি মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান।[১]

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহান বেশিরভাগ আমীর ওমরাহের সমর্থন যোগাড় করতে পারার ফলে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। তাঁর বাপ-ঠাকুর্দা বাবর, হুমায়ুন ও আকবরের মতো তিনিও ছিলেন একজন দয়ামায়াহীন ঘাতক, ধর্মান্ধ মুসলমান এবং লম্পটস্য লম্পট। কিন্তু আমাদের অসৎ ঐতিহাসিকরা মিথ্যা গল্প রটনা করলেন যে, লম্পট শাহজাহান তাজমহল-এর নির্মাতা। এই মিথ্যা রটনার ফলে তাঁরা শাহজাহানের মতো একজন বর্বর রাজাকে অতিশয় নম্র, মানবদরদী ও মহান এক প্রেমিক রূপে দেখাতে সমর্থ হলেন। এই সব ঘৃণ্য ঐতিহাসিকের দল এখনও তাঁদের মিথ্যা প্রচারে রত আছেন এবং শাহজাহান ও তার পত্নী আরজুমন্দ বানুর (পরে মমতাজ নাম দেওয়া হয়) মধ্যে রোমিও ও জুলিয়েটের মতো প্রেমের গল্প তৈরি করে চলেছেন।

এইসব ঘৃণ্য ঐতিহাসিকের দল আরও প্রচার করে চলেছেন যে, শাহজাহানের রাজত্বকাল ছিল ভারতের ইতিহাসের একটি সুবর্ণ যুগ এবং তাঁর আমলেই মোগল সাম্রাজ্য গৌরবের শিখরে

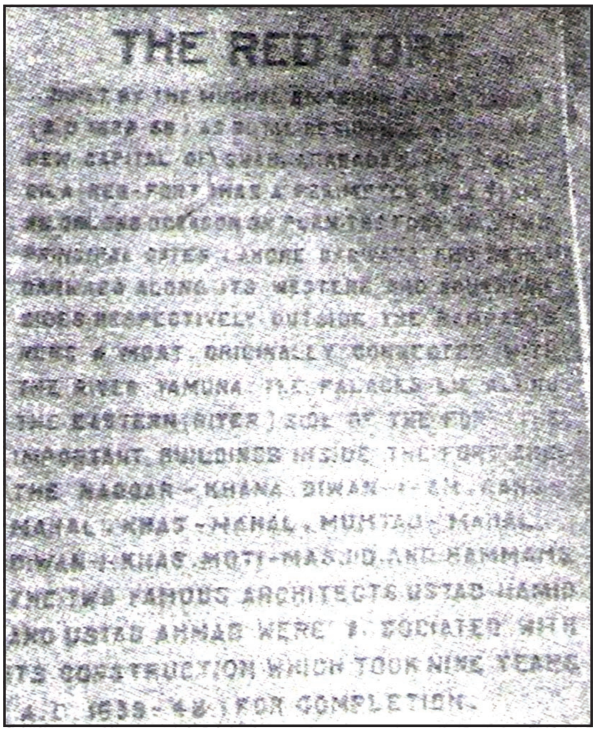

চিত্র : ২ : আর্কিওলজিকাল সার্ভের ফলক।

আরোহণ করে। তাঁরা আরও বলে চলেছেন যে, দিল্লীতে অবস্থিত আজকের প্রসিদ্ধ লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি এবং আগ্রা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের সময় শাহজাহান তা তৈরি করেন। তাঁরা আরও বলেন যে, আগ্রার সুপ্রসিদ্ধ শ্বেত পাথরের তৈরি তাজমহলও শাহজাহানের তৈরি। সেকুলার ঐতিহাসিক নামধারী এই সব ঘৃণ্য মেরুদণ্ডহীন জীবরা সর্বদাই মুসলমানদের পদলেহন করতে ব্যস্ত। তাই তাঁরা শাহজাহানের মতো একজন অতিশয় গোঁড়া, ধর্মান্ধ, লম্পটস্য লম্পট এবং অত্যাচারী সুন্নী মুসলমান শাসককে একজন মানবদরদী, অন্য ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল শাসক হিসাবে দেখাতে চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁরা সাফাই গেয়ে চলেছেন যে, তিনি তাঁর বাবা জাহাঙ্গীর ও ছেলে আউরঙ্গজেবের মতো অতটা গোঁড়া ছিলেন না। হিন্দু প্রজাদের প্রতি শাহজাহান ছিলেন অনেক বেশি উদার।

কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও কিছু কিছু সৎ ঐতিহাসিক আজও এদেশে বেঁচে আছেন, যাঁরা শাহজাহানের আসল চেহারাটা তুলে ধরতে কোনও সঙ্কোচ করছেন না। এই ব্যাপারে Keene's Handbook বলছে, "Personally, his nature was unbending and mingled with extreme pride and contempt of all. Shah Jahan surpassed all the Mughal emperors in autocratic pride and was the first of them to safeguard the throne by murdering all possible rivals.... According to Sir Thomas Roe, who knew Shahjahan, his nature was unbending and mingled with extreme pride and contempt of all"। অর্থাৎ শাহজাহান ছিল সমস্ত মোগল শাসকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নাসিক ও অত্যধিক গর্বিত নিরঙ্কুশ ক্ষমতালোভী গর্বোদ্ধত শাসক। সে তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বজায় রাখতে সিংহাসনের সমস্ত সম্ভাব্য দাবিদারকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। .... বৃটিশ রাজদূত স্যার টমাস রো ছিলেন শাহজাহানের খুব ঘনিষ্ঠ। তাঁর মতে, শাহজাহান ছিলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার জন্য অতিশয় গর্বিত, অত্যন্ত দুর্বিনীত এবং নিজেকে ছাড়া অন্য সকলের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী এক ব্যক্তি।

কীনস-এর হ্যান্ডবুক আরও বলছে, "Shahjahan in open rebellion (against his own father Emperor Jahangir) seized Fatehpur Sikri and sacked the city Agra, where, according to Della Valle, a noble Italian then on a visit to India, his army committed fearful barbarities. The citizens were compelled under torture to give up their hoarded treasures, and many ladies of quality were outraged and mutilated"। অর্থাৎ শাহজাহান তার পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, ফতেপুর সিক্রি অবরোধ করে এবং আগ্রা দখল করে। ডেলা ভাল্লী নামে এক ইতালীয় পর্যটক ওইসময় ভারতে এসেছিলেন এবং আগ্রায় অবস্থান করছিলেন। তিনি লিখে গিয়েছেন যে, সেই সময় শাহজাহানের সৈন্যরা চরম ও ভয়ঙ্কর বর্বরতার অনুষ্ঠান করে। নৃশংস, অমানবিক অত্যাচারের মাধ্যমে তারা শহরের নাগরিকদের সঞ্চিত ধনরত্ন ও সম্পদ লুণ্ঠন করে। সম্ভ্রান্ত (হিন্দু) পরিবারের রমণীদের প্রতি তারা যথেচ্ছ অত্যাচার চালায় ও তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে নেয়। (এখানে অত্যাচার বলতে ধর্ষণ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটা বলতে স্তন কেটে নেওয়া বুঝতে হবে)।[২]

ধর্মের ব্যাপারে শাহজাহান কতটা উদার ছিলেন একটা উদাহরণ দিলে তা ভাল বোঝা যাবে। শাহজাহান ধর্ম আলোচনার নাম করে নিয়মিতভাবে অন্যান্য ধর্মের পণ্ডিতদের ডেকে পাঠাতেন। নামমাত্র কিছু আলোচনার পর সে হুকুম দিত যে, ওইসব পণ্ডিতকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। যাঁরা তাঁর আদেশ মান্য করে ইসলাম গ্রহণ করতেন তাঁরা প্রাণে বেঁচে যেতেন। আর যাঁরা আদেশ অমান্য করতেন, তাঁদের অত্যন্ত জ্বালা যন্ত্রণা দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হত। বেশিরভাগ পণ্ডিতকে হাতীর পায়ের তলায় পিষে মারা হত।[৩] শাহজাহানের নিষ্ঠুরতা বর্ণনা করতে Keene's Handbook বলছে যে, বাদশা হবার আগে সিংহাসন নিরঙ্কুশ করতে তিনি তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, নিজের আপন ভাই খুসরুকে অন্ধ করে দেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পর তার মনে হল যে, অন্ধ খুসরুও বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই

শাহজাহান অন্ধ খুসরুকে নিজ হাতে চাকু দিয়ে হত্যা করেন। শাহজাহান তাঁর আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী শাহরিয়ারকে অন্ধ করে দেয়। অনেকের বিশ্বাস যে, সিংহাসন নিষ্কন্টক করতে শাহজাহান ঐ সময় তার দুই খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইকেও হত্যা করেন।[৪]

শাহজাহানের সীমাহীন লাম্পট্য, দ্বিচারিতা, দুর্বিনীত ব্যবহার, পাপাচার এবং অসৎ ও শয়তানী মনোবৃত্তির জন্য পিতা জাহাঙ্গীর তাঁকে শয়তান বলে ডাকতেন। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনী জাহাঙ্গীরনামা-তে লিখেছেন, 'আমি সবাইকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে জানালাম যে, এখন থেকে তাকে (শাহজাহানকে) সকলে শয়তান বলে ডাকবে এবং আমার কোনও আদেশে 'শয়তান' শব্দ থাকলে সেখানে শাহজাহানকে বুঝতে হবে।'[৫] শাহজাহান তাঁর পিতা ও পিতামহের মতোই হিন্দুর মন্দির ও প্রতিমা ভঙ্গের ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং হাজার হাজার হিন্দু মন্দির ভেঙেছিলেন। তাঁর এই কাজ বর্ণনা করতে আব্দুল হামিদ লাহোরি তাঁর 'বাদশানামা' গ্রন্থে লিখেছেন, "It had been brought to the notice of His Majesty that during the reign of his father many idol temples had been begun but remained unfinished at Benaras, the great stronghold of infidelity. The infidels were now desirous of completing them. His Majesty, the defender of the faith (of Islam) gave order that at Benaras, and throughout all his dominion in every place, all temples that had been begun should be cast down. It was now reported from the province of Allahabad that seventy-six temples had been destroyed in the district of Benaras"। অর্থাৎ, ''এই সময় বাদশার গোচরে আনা হল যে, তার আগে, তাঁর বাবার রাজত্বকালে মূর্তিপূজার যে সব মন্দির ভাঙা শুরু হয়েছিল, ভ্রান্ত ধর্ম ও মূর্তি পূজার পীঠস্থান বারাণসীতে সেই কাজ অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল। সেখানের কাফেররা আবার সেই সব মন্দির পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করছে। ধর্মের (ইসলামের) রক্ষক বাদশা সঙ্গে সঙ্গে হুকুম জারি করলেন যে, বারাণসী ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের সমস্ত নির্মীয়মান মন্দির ধ্বংস করা হোক। কিছুদিন বাদে আল্লাহাবাদ প্রদেশ থেকে খবর পাওয়া গেল যে, শুধু বারাণসী জেলাতেই ছিয়াত্তরটি মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে।''[৬]

এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক কানোয়ার লাল লিখেছেন, "Shahjahan was professedly a strict Sunni (Muslim) and probably at the instigation of Mumtaj Mahal, he had renewed the destruction of Hindu temples"। অর্থাৎ ধর্মের দিক থেকে শাহজাহান ছিল সত্যিকারের একজন নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলমান এবং পরে সম্ভবত বেগম মুমতাজ মহলের প্রেরণায় সে পুনরায় হিন্দু মন্দির

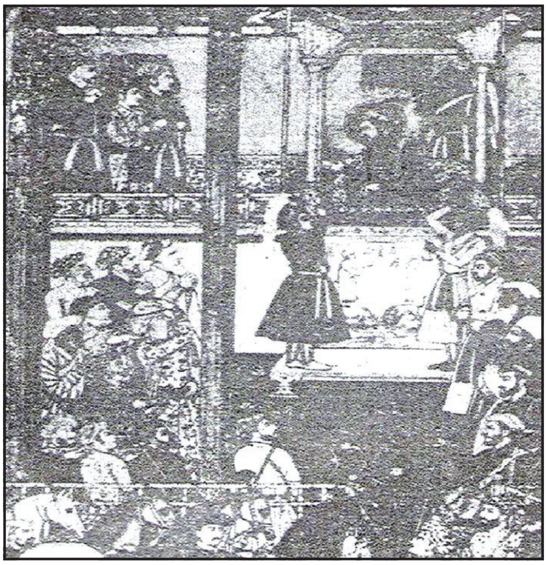

চিত্র : ৩

ভাঙা শুরু করেছিল।[৭] কিন্তু লজ্জার বিষয় হল, আমাদের সেকুলারবাদী ঐতিহাসিকের দল এই হিংস্র দানবকে একজন কোমলস্বভাবের প্রেমিক ও বিশাল এক স্থপতি হিসাবে প্রচার করে চলেছেন।

তাঁরা লিখছেন, "Though not gifted with the same originality and nobility of imagination, as that of his grandfather (i.e. Akbar), Shahjahan was also a great builder. His projects were many and compare favourably with those of Akbar in vastness and extensiveness. In Agra and Lahore forts he planned to replace the sandstone buildings of previous period by palaces and pavilions in marble, and this he carried out in a very large measure involving the construction of many new edifices. Not only that, he projected a new capital city in Delhi, that of Shahjahanabed where he built a fortress citadel of unusual dimensions and erected within it splended palaces, office buildings and other structures"। অর্থাৎ, যদিও শাহজাহান তাঁর ঠাকুর্দা (আকবর)-র মতো মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তির মালিক ছিল না, তথাপি শাহজাহান ছিলেন একজন অত্যন্ত উঁচু মানের স্থপতি। তার নির্মাণ-প্রকল্প ছিল অনেক এবং পরিকল্পনা ও আয়তনের বিশালত্বে সেগুলো আকবরের নির্মাণ কার্যের সঙ্গে তুলনীয়। আগ্রা ও লাহোরের পুরনো বালি পাথরের দুর্গগুলোকে সে সুপরিকল্পিতভাবে শ্বেত পাথরের প্রাসাদ ও মণ্ডপের দ্বারা শোভিত করে এবং এই রুচি তার অন্যান্য নির্মাণ কীর্তিগুলোতেও

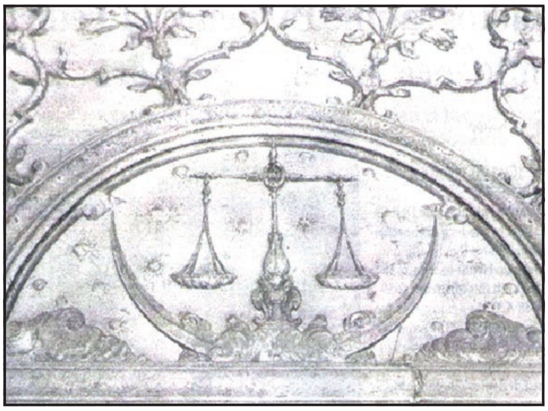

চিত্র : ৪ : রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপালের রাজকীয় প্রতীক।

প্রতিফলিত হয়। শাহজাহান দিল্লীতে যে নতুন রাজধানী শাহজাহানাবাদ তৈরি করে, তা মজবুত ও বিশাল ভিতের উপর শ্বেত পাথরের অন্যান্য সুন্দর বিস্তৃত প্রাসাদ, কার্যালয় এবং অন্যান্য সৌধ দ্বারা সজ্জিত হয়।[৮] এইসব ঐতিহাসিকের দল কেন যে বিদেশী দখলদার মুসলমান শাসকদের পদলেহন করে চলেছেন তা অনুধাবন করা সত্যিই দুরূহ।

পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, উপরিউক্ত কথাবার্তার মধ্য দিয়ে লেখক দিল্লীর লালকেল্লার কথা বলতে চেয়েছেন। এব্যাপারে তিনি আরও লিখেছেন, "In 1638, Shahjahan began in Delhi the construction of a new capital, that of Shahjahanabad, to contain within its perimeter a sumptuous palace-fortress for the accommodation of the imperial household and the court. The palace-fortress, the Red Fort it is known because of the red sandstone fabric of its rampart walls, has been designed on an unprecedented scale with all the amenities of the busy and luxurious life of an imperial house and court provided for within its walls in a regular and systematic order"। অর্থাৎ, শাহজাহান ১৬৩৮ সালে দিল্লীতে নতুন রাজধানী শাহজাহানাবাদ-এর নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন এবং তারই অঙ্গ হিসাবে বিশাল এক দুর্গ-প্রাসাদের নির্মাণকার্য শুরু করেন, যাতে করে সেই দুর্গ-প্রাসাদের মধ্যে রাজপরিবারের বসবাসের বিলাসবহুল বাসস্থান এবং রাজদরবারের সংস্থান করা যায়। আজকের লালকেল্লা হল সেই দুর্গ-প্রাসাদ। এর নাম লালকেল্লা কারণ লাল বালিপাথর দিয়ে তার প্রাচীর ও বাইরেটা তৈরি। ভিতরটা অবশ্য অকল্পনীয় বিশালতা ও রাজকীয় বিলাসবহুল ভাবে তৈরি।[৯] আজ সকলেরই চোখে পড়বে যে, লালকেল্লার প্রবেশ দ্বারে একটা ফলক, যা আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বসিয়ে দিয়েছে। তাতেও ওই একই কথা বলা হয়েছে যে, লালকেল্লার নির্মাতা হল মোগল সম্রাট শাহজাহান।

আজকের লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি নয় :

কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, আজকের লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি নয়। এই লেখকের মিথ্যার আবরণে দিল্লী আগ্রা ফতেপুর সিক্রি পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে অনেক প্রামাণ্য দলিলের সাহায্যে প্রমাণ করা হয়েছে যে, শাহজাহানের রাজত্বকালের বেশ কয়েকশত বছর আগেও দিল্লীতে লালকেল্লা বিদ্যমান ছিল। সেখানে আরও অনেক সাক্ষ্য প্রমাণের সাহায্যে দেখানো হয়েছে যে, শাহজাহান লালকেল্লা তৈরি করেছেন, সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচার। এখানে একটি চিত্র দেখানো হয়েছে। চিত্রটি ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ডে অবস্থিত বোদলিয়ান গ্রন্থাগার (Bodleian Library) -এ রক্ষিত আছে। ওই চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে শাহজাহান পারস্যের রাষ্ট্রদূতকে লালকেল্লার ভিতরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। এখানে বলা দরকার যে, ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে শাহজাহান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করে। এটা প্রমাণ করে যে, শাহজাহানের বহু পূর্বে লালকেল্লা বিদ্যমান ছিল। লালকেল্লা যে শাহজাহানের তৈরি নয়, তা প্রমাণ করতে এই একটি সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

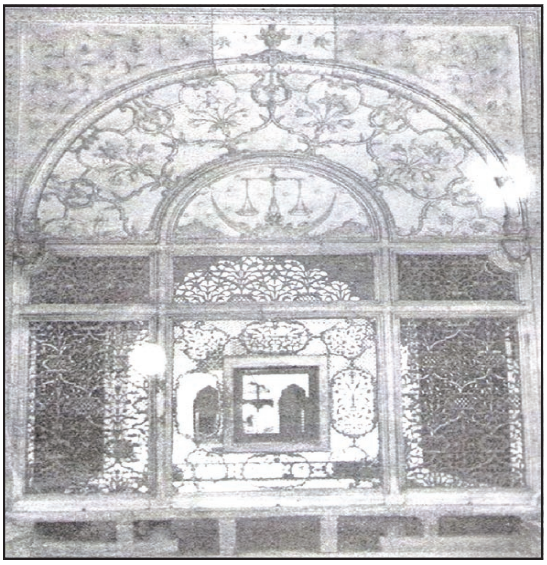

চিত্র : ৫ : শ্বেতপাথরের জালি।

তাহলে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, লালকেল্লার প্রকৃত নির্মাতা কে? এ ব্যাপারে ইউকিপিডিয়া ফ্রি এনসাইক্লোপিডিয়া (Wikipedia Free Encyclopedia) বলছে যে, দিল্লীর যে হিন্দু রাজা লালকেল্লা তৈরি করেছিলেন, তাঁর নাম দ্বিতীয় অনঙ্গপাল। রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপাল তোমর বংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই তোমর বংশীয় ক্ষত্রিয়রা ছিলেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের বা তাঁর প্রপৌত্র রাজা জন্মেজয়ের বংশধর। আজ যে স্থানে দিল্লী শহর অবস্থিত, মহাভারতের সময় তার নাম ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেখানে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে রাজা পরীক্ষিৎ

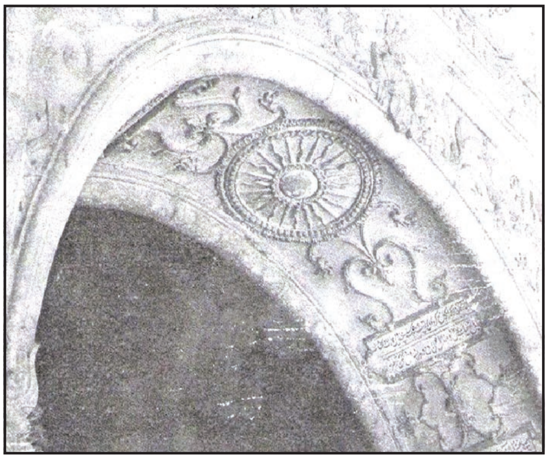

চিত্র : ৬ : খাস মহলের সিংহ দরজার উপরের খিলান।

এবং তারপর জন্মেজয় ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হন। কৌরবদের রাজধানী হস্তিনাপুর বন্যায় ডুবে নষ্ট হয়ে যাবার পর ইন্দ্রপ্রস্থ হয়ে ওঠে কুরু-পাঞ্চাল সাম্রাজ্যের সর্বপ্রধান শহর। যুধিষ্ঠিরের ২৮তম বংশধর ক্ষেমক ছিলেন কুরু-পাঞ্চাল রাজ্যের শেষ স্বাধীন সম্রাট। পরে তাঁর মন্ত্রিগণ ও পুত্রগণ তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং ক্ষেমক দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী নদীর তীরে নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক শতাব্দী পরে ক্ষেমক-এর বংশধরেরা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে অনঙ্গপাল তোমর-এর নেতৃত্বে ইন্দ্রপ্রস্থ পুনরায় দখল করেন।[১০]

দ্বিতীয় অনঙ্গপাল তোমারের রাজত্বকাল পর্যন্ত দিল্লী তোমর বংশীয় ক্ষত্রিয়দের দখলে ছিল। সম্রাট দ্বিতীয় অনঙ্গপাল দিল্লীতে লাল কোট নামে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করেন এবং সেই দুর্গই আজকে লালকেল্লা নামে পরিচিত। অনেকের মতে, গজনীর মহম্মদের আক্রমণ থেকে দিল্লীকে রক্ষা করার জন্যই দ্বিতীয় অনঙ্গপাল এই দুর্গ নির্মাণ করেন।[১১] দ্বিতীয় অনঙ্গপাল তাঁর দৌহিত্র পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরবর্তী রাজা হিসাবে মনোনীত করে যান। সেই সময় পৃথ্বীরাজ আজমীরের শাসনকর্তা ছিলেন। এইভাবে দিল্লীর শাসনভার তোমর ক্ষত্রিয়দের হাত থেকে চৌহান বংশের হাতে চলে যায়। রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপালের ২৩ জন ভাই ছিল এবং তাঁরা নিজ রাজ্য শাসন করতেন।[১২] অনেকের মতে, সেই সময় রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপালের ছেলেরা নাবালক ছিল বলে তিনি পৃথ্বীরাজকে সাময়িক ভাবে শাসনভার অর্পণ করে তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি ফিরে এলে পৃথ্বীরাজ তাঁকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করতে অস্বীকার করেন। যাই হোক, ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যে দিল্লীতে চৌহান বংশের আধিপত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

চিত্র ৪-এ দেখানো হয়েছে রাজা অনঙ্গপালের রাজকীয় প্রতীক, যা লালকেল্লার ভিতরে অবস্থিত খাস মহলের প্রধান দরজার উপরে অলংকৃত করা রয়েছে। কাজেই এটা লালকেল্লার প্রকৃত নির্মাতার প্রতীক। এতে দেখা যাচ্ছে, একজোড়া তরবারি, যাদের হাতল দুটো এক জায়গায় মিলিত হয়েছে এবং ফলাদুটো উপরদিকে উঠে রয়েছে। বাঁটদুটো যেখানে মিলেছে তার উপরে রয়েছে পবিত্র কলস। তার উপরে রয়েছে পদ্মফুল ও ন্যায় বিচারের প্রতীক দাঁড়িপাল্লা। তরোয়াল দুটোর ডগায় রয়েছে দুটো পবিত্র শঙ্খ। নীচে দুই কোণায় রয়েছে বড় আকারের আরও দুটো শঙ্খ। সমস্ত কিছুর পিছনে রয়েছে উদীয়মান সূর্য। এই সূর্য হল সূর্য বংশীয় কুরু বংশের প্রতীক। এই প্রতীকের মধ্যে হিন্দু চিহ্ন এত প্রকট যে তা সন্দেহাতীত - ভাবে প্রমাণ করে এর নির্মাতা অবশ্যই একজন হিন্দু ছিলেন।

কিন্তু এত স্পষ্ট প্রমাণ থাকতেও তার ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। বাঁটে বাঁটে লাগানো এবং উপর দিকে করা বাঁকানো ফলা দুটোকে আমাদের ঘৃণ্য সেকুলারবাদী ঐতিহাসিকরা, আর্কিওলজিকাল সার্ভের লোকেরা এবং মূর্খ গাইডের দল তাকে ইসলামী বাঁকা চাঁদ বলে সবাইকে বোকা বানিয়ে চলেছেন। হিন্দুর পবিত্র কলস এবং তার উপরে যে পদ্মফুলের কুঁড়ি তাঁদের নজরেই আসছে না।

চিত্র ৫-এ দেখানো হয়েছে শ্বেত পাথরের জালি। এই শ্বেত পাথরের জালি সম্পূর্ণভাবে হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতীক। এমনকি বাল্মীকির রামায়ণেও এই শ্বেত পাথরের জালির বর্ণনা রয়েছে। বেশিরভাগ ঐতিহাসিকেরও বিশ্বাস যে, এই জালির কাজ হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন। আজ আহমেদাবাদ, ফতেপুর সিক্রি প্রভৃতি স্থানে মসজিদে ও প্রাসাদে এই জালির কাজ রয়েছে। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, ওই সব প্রাসাদ বা মন্দির হিন্দুদের

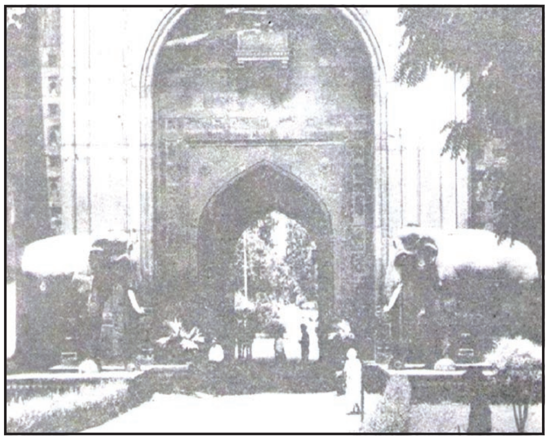

চিত্র : ৭ : লালকেল্লার দিল্লী সিংহ দরজায় পূর্ণাবয়ব হাতির মূর্তি।

তৈরি। মুসলমানরা ওই সমস্ত ইমারৎ গায়ের জোরে দখল করে এবং আজ তা মুসলমানদের তৈরি বলে দাবি করছে। কিন্তু ওই জালির উপরে অঙ্কিত রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপালের রাজকীয় প্রতীক প্রমাণ করছে যে, দিল্লীর লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি নয়।

চিত্র ৬-এ দেখানো হয়েছে, লালকেল্লায় অবস্থিত রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপালের খাস মহলের সিংহ দরজার উপরের খিলান।

তাতে শোভা পাচ্ছে দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য। এটা কুরুবংশের ক্ষত্রিয়দের দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ আগেই বলা হয়েছে যে, তাঁরা দাবি করেন, তাঁরা সূর্যের বংশধর। সূর্যের মাঝখানে রয়েছে দেবনাগরী হরফে ওঁ। তা ছাড়া আরও শোভা পাচ্ছে লতাপাতার উৎকীর্ণ চিত্রাদি, যার মধ্যে শোভা পাচ্ছে পদ্মফুল। এইসব সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে, আজকের লালকেল্লা বিদেশী মুসলমান দখলদার শাহজাহানের নির্মিত নয় এবং তার সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদের তৈরি বা রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপালের তৈরি।

কোনও মুসলমান ওই হাতির মূর্তি দুটো তৈরি করেনি এবং ওগুলো হিন্দুদের তৈরি।

এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, লালকেল্লা শাহজাহানের তৈরি হলে সেখানে হাতির মূর্তি থাকতো না। পক্ষান্তরে, দুর্গ, প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতিতে হাতির মূর্তি দিয়ে অলংকৃত করা অতি প্রাচীন এক হিন্দু ঐতিহ্য। হিন্দুর কাছে হাতি হল শক্তি, গৌরব, ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের প্রতীক। কাজেই বলা চলে যে, লালকেল্লার দিল্লী ফটকে দুটো পূর্ণাবয়ব হাতির মূর্তি অভ্রান্ত ভাবে প্রমাণ করছে যে,

চিত্র : ৮ : খাসমহলের সিংহ দরজার হাতল।

পরবর্তী প্রসঙ্গে যাবার আগে ইসলাম ধর্মের একটি বিশেষ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। ইসলাম ধর্ম অনুসারে কারও পক্ষে মূর্তি তৈরি করে, বা ছবি এঁকে, বা অন্য কোনওভাবে আল্লার সৃষ্টির নকল করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। যারা এই অপরাধ করবে, শেষ বিচার বা কেয়ামতের দিন তার বিচার করার সময় আল্লা তাদের সৃষ্ট ঐসব ছবি ও মূর্তিও হাজির করবেন। তখন আল্লা বলবেন, 'তোমরা যা যা সৃষ্টি করেছ, তাতে প্রাণ সংযোগ কর।' তারা স্বভাবতই তা পারবে না। তখন আল্লা বলবেন, 'আমার সৃষ্টির নকল করে আল্লা হতে চেয়েছিলে! যাও এখন নরকের আগুনের ইন্ধন হও।' কাজেই কোনও মুসলমানের পক্ষে আল্লার সৃষ্টির নকল করা কখনওই সম্ভব নয়। তাই মুসলমানদের দখল করা যেসব ইমারতে কোনওভাবে আল্লার সৃষ্টির নকল বা চিত্র বা মূর্তি আছে, সেখানে ধরে নিতে হবে সেগুলো মুসলমানরা তৈরি করেনি।

চিত্র ৭-এ দেখানো হয়েছে যে, লালকেল্লার দিল্লী-ফটকের দু'পাশে রয়েছে দুটো পূর্ণাবয়ব হাতির মূর্তি। আগেই বলা হয়েছে যে, কোনও মুসলমানের পক্ষে আল্লার সৃষ্টির নকল করে আল্লার ক্রোধের শিকার হওয়া সম্ভব নয়। তাই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, লালকেল্লা হিন্দুদের তৈরি। ঐতিহাসিকদের অনুমান যে, সম্রাট দ্বিতীয় অনঙ্গপাল ১০৬০ খৃষ্টাব্দে লালকেল্লার নির্মাণ করেন এবং ১১৯২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরি সম্রাট পৃথ্বীরাজকে পরাস্ত করে দিল্লী দখল করলে লালকেল্লা বর্বর মুসলমান আক্রমণকারীদের হস্তগত হয়।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, ১৬২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শাহজাহান মোগল সম্রাট ছিল। কাজেই বলা চলে যে, শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রায় ৬০০ বছর আগে লালকেল্লা নির্মিত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন যে, নক্করখানা ফটকের কাছেও এরকম এক জোড়া পূর্ণাবয়ব হাতির মূর্তি ছিল, যা মুসলমানরা ভেঙে ফেলে। অনেকের বিশ্বাস যে, ওই হাতি দুটো এবং আরও অনেক হিন্দু চিহ্ন ভেঙে ফেলা হয় এবং এই সমস্ত ভাঙা মূর্তি খাসমহলের মাটির নীচে পুঁতে ফেলা হয়। তাই আজ কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করলে ওইসব ভাঙা মূর্তি উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

চিত্র ৮-এ দেখানো হয়েছে লালকেল্লার খাসমহলের ফটকের পিতলের হাতল। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, হাতল দুটি তৈরি করা হয়েছে হাতির মূর্তির আদলে। হাতির উপরে বসে আছে মাহুত

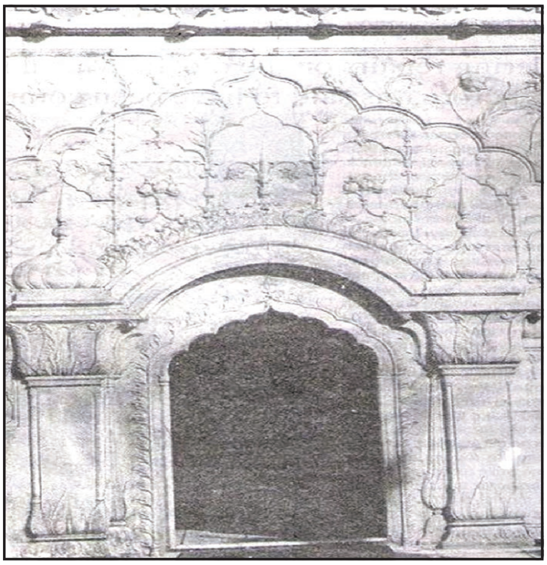

চিত্র : ৯ : মোতি মসজিদের প্রবেশদ্বার।

এবং হাতির শুঁড়ের সঙ্গে ঝুলছে কড়া। বলাই বাহুল্য যে, এখানেও আল্লার সৃষ্টির নকল করা হয়েছে, যা মুসলমানদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কাজেই বলা চলে, লালকেল্লা যে শাহজাহানের তৈরি নয় এটাও তার একটা প্রমাণ।

চিত্র ৯-এ দেখানো হয়েছে লালকেল্লা স্থিত মোতি মসজিদের প্রবেশদ্বার। ঘৃণ্য সেকুলার ঐতিহাসিকের দল প্রচার করে চলেছেন যে, শাহজাহানের ছেলে ঔরঙ্গজেব এই মোতি মসজিদের নির্মাতা। কিন্তু তাঁদের এই দাবি যে ভিত্তিহীন, এই চিত্র থেকে তার চারটি প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভব। প্রথমতঃ এই মসজিদের প্রবেশদ্বারে হিন্দু মন্দিরের শৈলী অতিশয় স্পষ্ট। দ্বিতীয়ত, খিলানের দুই প্রান্তে উৎকীর্ণ করা রয়েছে দুটি কলা গাছ। এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, পূজা-অর্চনার সময় মঙ্গল প্রতীক হিসাবে কলা গাছের ব্যবহার শুধু হিন্দুদের এক প্রাচীন রীতি। তৃতীয়ত, কোনও সৌধকে মোতি (রত্ন) নাম দেওয়া অতি পরিচিত হিন্দু রীতি। চতুর্থত, একমাত্র হিন্দু মন্দিরেই বিগ্রহকে পরিক্রমা করার ব্যবস্থা থাকে। মোতি মসজিদেও পরিক্রমা করার পথ রয়েছে। কোনও মসজিদে পরিক্রমা করার কোনও পথ থাকে না।

উপসংহার :

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আজকের লালকেল্লা সম্রাট শাহজাহান বা অন্য কোনও মুসলমানের তৈরি নয়। শাহজাহানের রাজত্বকালের প্রায় ৬০০ বছর আগে তোমর বংশীয় ক্ষত্রিয় সম্রাট দ্বিতীয় অনঙ্গপাল লালকোট নামে যে দুর্গ তৈরি করেছিলেন, সেই দুর্গই আজ লালকেল্লা নামে পরিচিত। কিন্তু লজ্জার ব্যাপার হল, সেকুলারবাদী ঐতিহাসিক নামে পরিচিত মেরুদণ্ডহীন ঘৃণ্য জীবের দল আজ প্রচার চালাচ্ছে যে, মোগল সম্রাট শাহজাহান হল ওই দুর্গের নির্মাতা। সবথেকে বড় কথা হল, আক্রমণকারী মুসলমানের দল এদেশে এসেছিল এদেশ লুণ্ঠন করতে, পয়সা খরচ করে দুর্গ, প্রাসাদ বানাতে নয়।

যে সব হিন্দু চিহ্ন লালকেল্লা বা অন্যান্য দুর্গ প্রাসাদে বিদ্যমান, এইসব ঐতিহাসিকের দল তা ব্যাখ্যা করে বলছেন যে, যেসব কারিগর ওইসব নির্মাণ কার্য করেছে, তার মধ্যে হিন্দু কারিগরও ছিল এবং তাঁরা ওইসব হিন্দু চিহ্ন নির্মাণ করেছেন। আর মুসলমান শাসকরা ধর্মের ব্যাপারে এত উদার ছিলেন যে, তাদের ওইসব নির্মাণ মেনে নিয়েছে। কিন্তু সকলেই স্বীকার করেন যে, তাদের এইসব বালখিল্য যুক্তি একটা গাধাও মেনে নিতে অস্বীকার করবে। যেদিন ভারতে একটি সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, একমাত্র সেদিনই এইসব মিথ্যায় ভরা ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন হবে। এই দেশের সত্য ইতিহাস রচিত হবে। সত্য ইতিহাস দেশের মানুষ জানতে পারবে।

উৎস নির্দেশ :—

(১) B. P. Saksena, History of Shahjahan of Dihli (rev. ed. 1958, repr. 1962); M. Lal, Shahjahan (1986). (২) Keene's Handbook for visitors to Agra and its neighbourhood, E A Duncan (Editor), Thacker's Handbook of Hindustan, P-25. (৩) Trans. Arch. Soc. Agra. (1978), Jan-June, viii-ix. (৪) Keene's Handbook for visitors to Agra and its neighbourhood, ibid, P-38. (৫) H. M. Elliot and J. Dowson, The History if India, as told by its own historians (in 8 Volumes), Low Price Publications, New Dehlhi (1996) VI, 281. (৬) H. M. Elliot and J. Dowson, ibid, VII, 36. (৭) Kanwar Lal, The Taj, R K Publishing House, Delhi, P-26. (৮) R. C. Majumdar (Gen. Ed), History & Culture of the Indian People (in 12 Volumes), Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai (1996), VII, 783. (৯) R. C. Majumdar (Gen, Ed), Bharatiya Vidya Bhawan, ibid, VII, 787. (১০) Benjamin Lewis Rice, Mysore and Coorg : Mysore, by districts, page 16. (১১) Ashri, Shashi Bhushan (2010), Delhi : A City of cities. Dehli, India : Anubhav Prakashan. p-8. (১২) Financial Commissioner - Amin Chand, Report on the revised land revenue settlement of the Hissar District of the Punjab (India) - 1875, P- 3.

চুচুলের যত্নে অপরিহার্য

গ্রাফাইটিস

- চুল পড়া বন্ধ করে
- চুলের স্বাভাবিক রং ধরে রাখে
- খুসকি দূর করে
- মাথার তালুর যে কোনও সমস্যা দূর করে
- চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে
- চিটচিটে ভাব থাকে না

অ্যাসিডিটির জন্য

অ্যাসিডোলিন

অম্বল, গ্যাস ও বুকজ্বালার
একমাত্র স্থায়ী প্রতিকারক

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ভয় নেই

ঝাল মশলাদার খাবার কোনও বাধা নেই

PBM

পি. ব্যানার্জী মিহিজাম ফার্মাসিউটিক্যালস্

ডাঃ পি. ব্যানার্জী (মিহিজাম) -এর হোমিওপ্যাথি আবিষ্কার

জবাব

শেখর বসু

শান্ত মুখে বেশ কিছুক্ষণ ধরে লম্বা বক্তৃতাটা শোনার পরে জয়ন্ত রায় আর একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু এভাবে এগুলো করা মানে পরের দয়া ভিক্ষা করা। পরের দয়া নয়, নিজের জোরে কিছু করা যায় কিনা তাই ভাবুন। প্রথমেই এত বড় প্রজেক্ট হাতে নেওয়ার কী দরকার? ছোট মাপে কিছু একটা করুন না। ছোট ব্যাপার হলে অন্যের কাছে হাত পাততে হবে না। একটু একটু করে পুরো ব্যাপারটা বেড়ে উঠুক।

নিজের পায়ে দাঁড়ানোর আনন্দই আলাদা, আর তাতে কাজও হয় কাজের মতো।'

নিজের পায়ে দাঁড়াবার কথা যিনি এত জোর দিয়ে বললেন, শুধু তিনিই নন— এঘরের বাকি তিনজন মানুষের পাও অক্ষত নয়। জয়ন্ত রায়, মোটর দুর্ঘটনায় ডান পা খুইয়েছেন তিন বছর আগে। হাঁটুর নীচে তাঁর নকল পা লাগানো। স্যুটবুট পরে বসে থাকলে এই নকল পা-টাকে বোঝা যায় না। হাঁটলে ধরা পড়ে। একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন।

ঘরের বাকি তিনজনের একজন লরির শিকার। চার বছর আগে পর্যন্ত তরুণ সেনের প্রায় সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল একটা লাল মোটর সাইকেল। চমৎকার স্পোর্টসম্যান ছিলেন তিনি, কিন্তু একদিন চলন্ত লরির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা খেয়ে সম্পূর্ণ অন্য শ্রেণীর মানুষ হয়ে গেলেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে। ঊরুর গোড়া থেকে একটা পা কেটে বাদ দিতে হল।

আগের সেই খেলোয়াড় জীবন এখন বুঝি গতজন্মের ব্যাপার। কিন্তু তাঁর প্রচণ্ড জীবনীশক্তি অন্য খাতে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে এখন মাঝারি মাপের শিল্পপতি জয়ন্ত রায়ের বসার ঘরে এনে হাজির করিয়েছে। সঙ্গে আরও দু'জন সমভাবাপন্ন মানুষ।

আজ এখানে এতক্ষণ ধরে যা আলোচনা হয়েছে, সে ব্যাপারে জয়ন্ত রায় ওঁদের সঙ্গে একমত। কিন্তু পরের কাছে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে ওঁর দ্বিধা ছিল। চিরটাকাল নিজের পায়ের ওপরে দাঁড়িয়েছেন বলে নিজের পায়ের ওপর ওঁর অগাধ আস্থা।

প্রচণ্ড এক জীবনীশক্তির আলো তরুণ সেনের চোখমুখ থেকে কেমন যেন ঠিকরে বার হচ্ছিল। ওঁর কথাতেও যেন সেই আলোর দীপ্তি। ভরাট গলায় বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন মিস্টার রায়। নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে না পারলে কোনও কাজই ঠিকভাবে করা যায় না। তবে গোড়ার দিকে একটু বাইরের সাহায্য পেলে ভাল হয়। সরকারের কাছ থেকে আমরা পনেরো বিঘে জমি পেয়েছি— এটা তো বিরাট ব্যাপার। তবে ওই জমিটা ঠিকভাবে কাজে লাগাতে হলে প্রচুর টাকার দরকার। আপনি আর একবার আর্কিটেক্টের বানানো ডিজাইনটা দেখুন না। এই যে এদিকে প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনের জায়গা, ওপাশে ওয়ার্কশপ, এদিকে ক্লিনিক— সব কিছু ঠিক ভাবে করতে হলে বিরাট অঙ্কের টাকার প্রয়োজন। এস্টিমেটেড কস্টের অন্তত থার্টি পারসেন্ট হাতে না এলে তো কাজ শুরু করা যাবে না। তাছাড়া এটা তো ঠিক, পরের কাছে হাত পাতা নয়। আমরা চ্যারিটি শো করছি, শোয়ের টাকা আর স্যুভ্যনিরের বিজ্ঞাপনের টাকা হাতে এলে কাজটা শুরু করে দেওয়া যাবে। আপনি প্লিজ আর অমত করবেন না।'

তরুণ সেনের কণ্ঠস্বর, সেন্টার-টেবিলের ওপর ছড়ানো আর্কিটেক্টের বানানো ডিজাইন চমৎকার বসার ঘরে এমন একটা মায়া সৃষ্টি করে ফেলেছিল যে, জয়ন্ত রায় আর আপত্তি তুলতে পারলেন না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের শো কবে?'

'একুশে এপ্রিল।'

'কখন শুরু হবে?'

'সকাল ন'টায়, ঘন্টা-তিনেকের শো।'

'কোথায় হবে?'

'রবীন্দ্র সদনে।'

'ঠিক আছে, আমি যাব, তবে প্রেসিডেন্ট-ট্রেসিডেন্ট হতে পারব না।'

সামনের তিনজন ব্যাকুল মানুষের আবেদনের সামনে জয়ন্ত রায়ের আপত্তি টিকল না। তরুণ সেন বললেন, 'আমাদের বক্তব্য দু-চার কথায় আপনাকেই জানাতে হবে।'

অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠেছিল জয়ন্ত রায়ের মুখে। 'কী বলব?'

'যা, আমাদের সামনে বলেন সেই সব কথাই বলবেন— একটু শুধু অন্য ভাবে। ওই তো আবেদন যেমন হয়।'

'কেমন হয়?'

তরুণ সেন হাসলেন। 'আপনি বোধহয় আমার পরীক্ষা নিচ্ছেন।'

'না-না, কী বলব বলুন তো?'

'বলবেন— আপনাদের কাছে একটাই আবেদন— আপনারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান। এই সমস্যাটা আমাদের প্রত্যেকেরই সমস্যা। কোন্ পরিবারে প্রতিবন্ধী নেই বলুন তো? আমরা সবাই চাই তাদের প্রত্যেকের সুস্থ পুনর্বাসন হোক। পরের দয়ায় নয়, নিজেদের যোগ্যতায় তারা বেঁচে থাকুক। আমরা শুধুমাত্র তাদের কাজের সুযোগটুকু তৈরি করে দেব। আপনাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা আমাদের পাথেয়।'

তরুণ সেনের আবেদনের এই বয়ান শুনে লাজুক মুখে জয়ন্ত রায় বললেন, 'এত ভালো ভালো কথা সাজিয়ে-গুছিয়ে বলাই তো কঠিন! আমাকে একটু লিখে দেবেন তো।'

জয়ন্ত রায়ের কথা শুনে সামনের তিনজন শ্রোতাই হেসে ফেলেছিলেন। হাসতে হাসতেই তরুণ সেন বললেন, 'চেম্বার অফ কমার্সের মিটিংয়ে প্রায়ই তো আপনার বক্তৃতা দিতে হয়। বক্তৃতা দেওয়াটা আপনার কাছে কোনও সমস্যাই নয়। তবে আমাদের বক্তব্যের আউটলাইন কালকেই আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আজ তাহলে উঠি।'

ক্র্যাচ বগলে তিনজন মানুষ দোতলা থেকে একতলায় নামার সময় জয়ন্ত রায় পেছনে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকবার বললেন— 'সাবধানে নামবেন।'

চ্যারিটি শো শুরুর আগে সামান্য কয়েকটা দিন হাতে। এই ক'টা দিন কয়েকজন প্রতিবন্ধী মানুষ আরও অনেক

প্রতিবন্ধী মানুষের সুস্থ পুনর্বাসনের উদ্যোগ আয়োজনে প্রচণ্ড পরিশ্রম করলেন। সাধ্যের বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত খাটাখাটুনির জন্য একটু অসুস্থ হয়ে পড়লেন কেউ কেউ। কিন্তু সবার মনেই আনন্দ, মহৎ কাজে শারীরিক কষ্ট তো তুচ্ছ ব্যাপার।

জয়ন্ত রায়ের চেষ্টায় প্রত্যাশার অনেক বেশি বিজ্ঞাপন পাওয়া গিয়েছে স্যুভ্‌নিরে। ডোনেশনের পরিমাণও বেশ ভাল। রবীন্দ্র সদনের অনুষ্ঠানের এখনকার নামকরা শিল্পীদের প্রায় প্রত্যেকেই আসছেন, অথচ একটা পয়সাও নেবেন না কেউ।

একুশে এপ্রিলের সকালে বাড়তি একটা তৎপরতা দেখা গিয়েছিল উদ্যোক্তাদের মধ্যে। সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে রবীন্দ্র সদনে হাজির হয়েছিলেন সবাই। জয়ন্ত রায়ের সঙ্গে এসেছেন তাঁর অফিসের বেশ কয়েকজন অফিসার। তাঁদের ছোটাছুটি দেখলে যে কেউ বুঝতে পারবেন, মালিককে খুশি করা নয়, মহৎ কাজ করার আনন্দ পাচ্ছেন তাঁরা।

স্বেচ্ছাসেবকদের বুকে ব্যাজ, বিলি করার জন্য স্যুভ্‌নির হাতে। ফুল দিয়ে চমৎকার ভাবে সাজানো হয়েছে রবীন্দ্র সদনের মঞ্চ। উদ্যোক্তাদের অনেকেই এই প্রথম মঞ্চে উঠলেন, ব্যাকস্টেজে গেলেন।

চেয়ারে বসে সামান্য একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বেশ কয়েকজন অনুরোধ করেছিলেন জয়ন্ত রায়কে। কিন্তু তিনি কারও কথাতেই কান দেননি। তাঁর কৃত্রিম পায়ে কীভাবে যেন অতিরিক্ত জোর এসে গিয়েছিল। অত বড় ব্যাকস্টেজের সব প্রান্তে হেঁটে হেঁটে ছোট-বড় সব কাজেরই তদারক করে যাচ্ছিলেন সমানে। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছিল।

অনুষ্ঠান শুরু করতে করতে সওয়া ন'টা বেজে গেল। প্রথমে উদ্বোধনী সঙ্গীত। ওই গানটা শেষ হলে পাঁচজন উদ্যোক্তাকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে ঢুকবেন জয়ন্ত রায়। সভাপতি হিসেবে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখার পরেই শুরু হবে মূল অনুষ্ঠান।

সভাপতির বক্তব্য খুব সুন্দর ভাবে একটা কাগজে লিখে বেশ কয়েকদিন আগেই জয়ন্ত রায়ের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন তরুণ সেন। ভাষণ পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে সভাপতি বলেছিলেন, চমৎকার বক্তব্য। অল্প কথার মধ্যে আমাদের পুরো বিষয়টাই তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এত ভালো ভালো কথা মনে রাখা কঠিন, আমার স্মৃতিশক্তিও ভালো নয়।

শুনে শ্রোতারা একটু উঁচু গলায় হেসেছিলেন। একটা কথাই ঘুরেফিরে এসেছিল বারবার— আমরা সবাই জানি চেম্বার অফ কমার্সে আপনি দারুণ দারুণ সব বক্তৃতা দিয়ে থাকেন।

শুরু হল পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান। প্রবীণ সঙ্গীতশিল্পী হেমাঙ্গ গুহ সময়োপযোগী গান গাইলেন— যুঝিবারে শকতি দাও প্রভু। গানের কথা, সুরের মূর্ছনা পরিবেশকে যথেষ্ট ভাবগম্ভীর করে তুলেছিল।

গান গেয়ে তিনি ফিরে আসার পরেই উইংসের আড়াল

থেকে মঞ্চে ঢুকলেন আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি জয়ন্ত রায়। ওঁর পেছনে উদ্যোক্তাদের পাঁচজন— প্রত্যেকেই প্রতিবন্ধী। একজন বাদে প্রত্যেকের হাতে ক্রাচ বা লাঠি।

বিশাল মঞ্চ। মঞ্চের একেবারে সামনের দিকে মাইক। পঙ্গু এবং খোঁড়া মানুষদের পক্ষে এই পথটুকুই অনেকখানি। বিচিত্র সব ভঙ্গিতে শরীরের ভার কোনওমতে সামলে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছিল মিছিলটি। তাই দেখে হঠাৎই ভাবগম্ভীর পরিবেশকে ছিঁড়ে ফেলে চাপা হাসির একটা ঢেউ বয়ে গিয়েছিল প্রেক্ষাগৃহে।

মিছিলের একেবারে সামনে ছিলেন জয়ন্ত রায়। কুৎসিত ওই হাসির ধাক্কায় তিনি কেমন যেন সিঁটিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর দুটি পায়ের একটি কৃত্রিম, টের পাচ্ছিলেন, ওই পায়ের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ কেমন যেন হারিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়— তাঁর রক্তমাংস, অস্থিমজ্জা দিয়ে তৈরি আসল পা-ও বুঝি অবশ হয়ে আসছিল। আশঙ্কা হচ্ছিল, এই ভাবে আরও কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলে তাঁর পা দুটো বোধহয় শরীরের ওজন আর ধরে রাখতে পারবে না। মঞ্চের ওপর আছড়ে পড়বেন যে কোনও মুহূর্তে।

সভাপতি থমকে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পেছনের এঁকেবেঁকে চলা মিছিলটাও থমকে গিয়েছিল।

মঞ্চের মধ্যিখানে ওই ভাবে ওঁদের থেমে যেতে দেখে হলের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠেছিল। গুঞ্জন শুনেই আঁতকে উঠেছিলেন জয়ন্ত রায়। তাঁর মনে হয়েছিল, এর পরেই বুঝি জঘন্য অট্টহাসিতে ফেটে পড়বে গোটা হলটা। ওই হাসি থামাবার একটাই মাত্র উপায়— তাড়াতাড়ি মাইকের সামনে পৌঁছে যাওয়া। কিন্তু কীভাবে?

শরীরের সমস্ত শক্তি আসল আর নকল পায়ের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন তিনি। তারপর একটা পা কোনওমতে এগিয়ে দিলেন সামনের দিকে। পা টলমল করে উঠেছিল, কিন্তু না, পড়ে গেলে চলবে না।

অতি কষ্টে ডান পা ছড়িয়ে এগিয়ে গেল বাঁ পা। কয়েক মুহূর্ত দম নেওয়ার পরে আবার ডান, তারপর আবার বাঁ।

তাঁর চোখের সামনে একঝাঁক হলুদ আলোর রেণু। ওই রেণুর ভেতর দিয়ে বেশ কিছুটা দূরে দেখা যাচ্ছে মাইক। মাইক ছাড়া বুঝি আর কোথাও কিছু নেই। ওই মাইকের সামনে পৌঁছানো যেন বাঁচা-মরার প্রশ্ন। দুর্বল, শক্তিহীন পা-দুটোকে টেনে টেনে মাইকের দিকে কোনওরকমে এগোবার চেষ্টা করতে লাগলেন জয়ন্ত রায়। তাঁর এগোবার গতির সঙ্গে তাল রেখে শামুকের মতো নড়ছিল পেছনের আঁকাবাঁকা মিছিলটা।

বিশাল হলের একতলা, দোতলা প্রায় ভর্তি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কোথাও কোনও শব্দ নেই। গোটা হল বোধহয় নিঃশ্বাস বন্ধ করে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর এক খেলা দেখছিল। ক্ষুধার্ত সিংহের সঙ্গে খালি হাতে কোনও বীরের লড়াই দেখার উত্তেজনা কি এইরকম হয়!

জয়ন্ত রায় এত খুঁড়িয়ে কখনও হাঁটেন না, কিন্তু আজ কী এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর শরীর সামনের দিকে বেশ কিছুটা ঝুঁকে পড়েছিল। দু-একবার পড়ে যেতে যেতে কোনওমতে সামলে নিয়েছিলেন নিজেকে।

উইংসের আড়ালে অস্থিরতা, কিন্তু কিছু করার নেই। জয়ন্ত রায় বারবার বলে গেছেন— আমাদের সাহায্য করার জন্য আপনারা কিন্তু কখনোই মঞ্চে আসবেন না। তাঁর আদেশ অমান্য করার সাধ্য নেই কারও। উদ্বেগ আর অস্থিরতা নিয়ে উইংসের আড়ালের চোখগুলো তাকিয়েছিল ছোট্ট মিছিলের সামনের মানুষটার দিকে। প্রেক্ষাগৃহের সব চোখ ওঁর ওপর।

পা-দুটোকে টেনে-হিঁচড়ে মাইকের দিকে তিনি আরও কিছুটা এগিয়ে গেলেন। দূরত্ব কমেছে ঠিকই, কিন্তু বাকি পথটুকু পেরুনোও এই মানুষটির পক্ষে কম নয়। পকেট থেকে রুমাল বার করে তিনি মুখচোখের ঘাম মুছলেন। তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করলেন।

এভাবে হাসার একটাই অর্থ— আমি শক্ত আছি, আমাকে নিয়ে আপনারা দয়া করে ভাববেন না। এত বড় প্রেক্ষাগৃহের সব প্রান্ত থেকে মঞ্চের একটা মানুষের মৃদু হাসি দেখা সম্ভব নয়। সামনের সারির কেউ কেউ হয়তো দেখেছে, কিন্তু তাদের কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। জয়ন্ত রায় রুমাল পকেটে ঢুকিয়ে রেখে মাইক লক্ষ্য করে আবার পা টেনে টেনে হাঁটতে শুরু করলেন।

মাইক আর মানুষটির মধ্যিখানের দূরত্ব এখন আরও খানিকটা কমে এসেছে। দূরত্ব কমার জন্যই হোক আর দ্বিতীয়বার ঠাট্টার হাসি না শোনার জন্যই হোক, রায়ের আসল পায়ের জোর ফিরে এসেছিল কিছুটা। নকল পায়ের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও তৈরি হচ্ছিল একটু একটু করে।

হাঁটার গতি এখন আগের চাইতে সামান্য বেশি। শরীরের সেই টালমাটাল ভাবটাও নেই। জয়ন্ত রায় মুখ সামান্য ফাঁক করে বুকের মধ্যে বাতাস টেনে নিয়েছিলেন অনেকটা।

মাইক আর মাত্র কয়েক পা। শেষের এই কয়েক পা আগের তুলনায় সামান্য জোরে হেঁটে না এসে তিনি মাইকের গলা চেপে ধরলেন হাত বাড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে হল জুড়ে প্রচণ্ড হাততালি উঠেছিল। ম্যারাথন দৌড়ের শেষে কোনও দৌড়বীরের কপালেও বুঝি এত হাততালি জোটে না।

মাইকের ওপর কয়েক মুহূর্ত শরীরের ভর রেখে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন শ্রীরায়। তারপর

পেছন ফিরে সঙ্গীদের ইঙ্গিত করতেই ওঁর দু'পাশে এসে দাঁড়ালেন সবাই। প্রত্যেকেই একসঙ্গে হাত তুলে নমস্কার জানালেন শ্রোতাদের উদ্দেশে। নমস্কারের উত্তরে ঝিমিয়ে যাওয়া হাততালি আর একবার তেতে উঠেছিল।

জয়ন্ত রায় হঠাৎই কেমন যেন অসন্তুষ্ট হয়ে দু-হাত ওপরে তুলে দর্শকদের শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হাততালি থামতে একটু সময় লেগেছিল।

দর্শকদের প্রত্যেকের হাতেই স্যুভ্নির। স্যুভ্নিরের প্রথম পাতাতেই আজকের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানসূচী ছাপানো আছে। হেমাঙ্গ গুহর উদ্বোধনী সঙ্গীতের পরেই সংস্থা-সভাপতি জয়ন্ত রায়ের অভিভাষণ।

সভাপতি রুমাল দিয়ে আর একবার মুখ মুছতে মুছতে সাজানো গোছানো বড়সড় ওই বক্তৃতাটা মনে করার চেষ্টা করলেন। বহুবার পড়ার পরে ওটা প্রায় মুখস্থই হয়ে গিয়েছিল। কণ্ঠস্বর কোথায় একটু ওপরে তুলবেন, কোথায় সামান্য নামাবেন— তারও একটা মহড়া দেওয়া ছিল। কিন্তু অবাক কাণ্ড, দীর্ঘ ওই বক্তৃতার একটা শব্দও এই মুহূর্তে ওঁর মনে পড়ল না। আর, মনে করতে না পারার জন্যই বোধহয় অদ্ভুত ধরনের একটা স্বস্তি বোধ করছিলেন মানুষটি। টের পাচ্ছিলেন, ওঁর আসল আর নকল পায়ের জোরও ফিরে এসেছে অনেকটা।

এক ঝটকায় উনি মাইকের মুখটা নিজের মুখের কাছে টেনে এনে বললেন, 'বন্ধুগণ, আপনাদের হাততালির জন্য ধন্যবাদ। তবে দয়া করে আর হাততালি দেবেন না। তার কারণ আমরা সার্কাস দেখাবার জন্য মঞ্চে উঠিনি।'

শেষের কথাটা শুনে হলের মধ্যে একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই শব্দ ছাপিয়ে মাইক্রোফোনে আবার গমগম করে উঠল জয়ন্ত রায়ের ভরাট গলা— 'আজকের এই অনুষ্ঠান করার পেছনে আমাদের একটা বড় পরিকল্পনা আছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য আমরা একটা পুনর্বাসন কেন্দ্র খুলতে যাচ্ছি। ছোটখাটো একটা হাসপাতাল খোলার ইচ্ছেও আছে আমাদের। প্রতিবন্ধীরা যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তার জন্য আমরা একটা ওয়ার্কশপও খুলব। সেখানে নানা ধরনের কাজ শেখানো হবে। ওই সব কাজ শিখতে পারলে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে বেঁচে থাকার জন্য অপরের অনুকম্পা বা অনুদানের কোনও প্রয়োজন হবে না। আমাদের ওইসব কাজকর্ম সম্পর্কে স্যুভ্নিরে একটা বড় বিবরণ ছাপানো হয়েছে। আপনাদের কেউ উৎসাহ বোধ করলে দেখে নিতে পারেন।'

কথাগুলো একটু উঁচু গলায় বলার জন্য জয়ন্ত রায়ের একটু বুঝি হাঁপ ধরে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে আবার মুখ খুললেন উনি— 'আর একটা খবর। এই খবরটায় আপনারা খুশি হতে পারেন।'

জয়ন্ত রায় একটু থেমেছিলেন। তারপর গলার স্বর এক পর্দা উঁচুতে তুলে বললেন, 'আপনাদের খুশি হওয়ারই খবর। আমাদের এই ওয়ার্কশপে শারীরিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষদের জন্যও কিছু চাকরির ব্যবস্থা থাকবে। নমস্কার।'

এবার আর হাততালি পড়ল না। বক্তৃতা থামিয়েই ডানদিকের উইংস লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিলেন জয়ন্ত রায়। ওঁর আসল পায়ে আগের মতো জোর ফিরে এসেছে, নকল পায়ের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও কাজ করছে পুরোপুরি। সামান্য একটু খোঁড়ালেও বেশ সহজ ভাবে উইংসের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন তিনি।

ওঁর পিছনে ক্রাচ বগলে আর লাঠি হাতে প্রতিবন্ধীরা। পঙ্গু মানুষদের বিচিত্র ভঙ্গিতে বেঁকেচুরে হাঁটা দেখে এবার আর হাসির ঢেউ গড়াল না হলের মধ্যে।

উইংসের কাছেই ছিলেন তরুণ সেন। জয়ন্ত রায় সেখানে পৌঁছুতেই তিনি উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'ঠিক বলেছেন আপনি। কী বিচ্ছিরি ভাবে হেসে উঠেছিল লোকগুলো। যেন মজা দেখছে! উচিত কথাই আপনি শুনিয়ে দিয়েছেন ওদের।'

রায়ের লালচে চোখমুখ চক্‌চক্ করছিল ঘামে। হক কথা মুখের ওপর শুনিয়ে দেওয়ার জন্য আরও কয়েকজন এগিয়ে এসেছিল ওঁর কাছে।

উইংসের আড়ালে রায়ের চারপাশে প্রতিবন্ধীদের ভিড়। তাদের সঙ্গে আছে ক্রাচ, লাঠি, কৃত্রিম অঙ্গ আর হুইলচেয়ার। প্রেক্ষাগৃহের নিষ্ঠুর লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। কিন্তু পরের পর সমবেদনার কথা আর লাগসই বক্তৃতাবাবদ অভিনন্দন শুনে শুনে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন জয়ন্ত রায়।

ভেতরদিকে আর একটু সরে এসে উইংসে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। আশপাশের সবাই তো নিজেদের লোক, তবু হঠাৎই কেমন যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল, পায়ের জোর যে কোনও মুহূর্তে কমে যেতে পারে আবার। হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বলে একটু বুঝি আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন, 'পরের অনুষ্ঠান শিগ্‌গির শুরু করে দিন।'

অনুষ্ঠানসূচী ঘোষণা করার জন্য একজন ঘোষককে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। একটু বাদেই মাইক্রোফোনে তার গম্ভীর গলা শোনা গেল। 'নমস্কার, আমরা আমাদের মূল অনুষ্ঠান শুরু করছি এবার। প্রথমেই আপনারা শুনতে পাবেন আপনাদের সেই প্রিয় গান— 'সই, পিরিতি বিষম জ্বালা। গাইছেন আমাদের সকলের প্রিয় গায়িকা রুনি শুক্লা।'

ঘোষণাটি শেষ হওয়া মাত্তর প্রেক্ষাগৃহে হাততালির ঝড় উঠেছিল। সভাপতি ও তাঁর সঙ্গীরা মঞ্চ ছাড়ার পরেই ফেলে দেওয়া হয়েছিল মস্ত পর্দা। হাততালির ঝড়ের মধ্যেই সেই পর্দা উঠতে শুরু করল আবার।

জনপ্রিয় গায়িকাকে দেখতে দেখতে তার গান শোনার জন্য উদ্যোক্তাদের সবাই উইংসের আড়ালে পছন্দসই জায়গা বাছার জন্য সামান্য হুড়োহুড়ি শুরু করে দিয়েছিল।

জয়ন্ত রায় পিছিয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে আরও পেছনে। শেষে ব্যাকস্টেজের মধ্যিখানে। এই জায়গাটা আলো-আঁধারিতে মোড়া। পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোর এককণাও নেই সেখানে। নেই কোনও কলাকুশলী বা উদ্যোক্তাদের কেউ। ব্যাকস্টেজ এই মুহূর্তে আশ্চর্য রকমের নিরিবিলি। সিলিংটা বেশ উঁচু, ওপর দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে নীচের দিকে তাকালেন তিনি। গান শুরু করেছেন জনপ্রিয় গায়িকা। তাঁর সুরেলা গলায় পোষা পাখিরা খেলা করছিল অক্লেশে। খেলা করতে করতে পিরিতির বিষম জ্বালাকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল বাতাসে। ওই গান শুনতে শুনতে জয়ন্ত রায়ের মনে হল— হ্যাঁ, সব কিছুই আগের মতো ঠিকঠাক আছে। নিজের পায়ে দিব্যি জোর পাচ্ছিলেন তিনি।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞান দর্শন ও জাতীয়তাবাদ

অচিন্ত্য বিশ্বাস

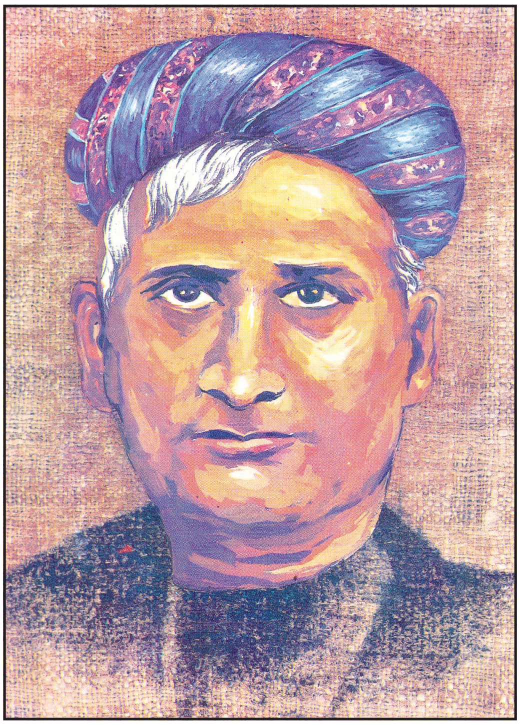

'বিজ্ঞান রহস্য' প্রবন্ধমালার একাংশে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন আমাদের দর্শন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কেমন কাছাকাছি সিদ্ধান্তে আসছে। ভারতীয় দর্শন উপলব্ধি ও যুক্তির শৃঙ্খলে গড়ে তুলেছে এক অভাবিত পূর্ব জগৎ বিচারের উপায়। খৃষ্টীয়ান ভাব বিশ্ব এই বিচার বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারেনি। বাইবেল প্রচারিত সৃজন কথাকে বঙ্কিম দেখিছেন এইভাবে— ''যেদিন জগদীশ্বর কুম্ভকাররূপে কাদা ছানিয়া পৃথিবী গড়িয়া ছয় দিনে তাহাতে মনুষ্যাদি পুত্তল সাজাইয়াছিলেন, খৃস্টানেরা অনুমান করেন যে, ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে।' ('কত কাল মনুষ্য?' প্রবন্ধ, 'বিজ্ঞান রহস্য')। পাশ্চাত্যে বিকশিত বিজ্ঞান ধর্মশাস্ত্রের এই প্রত্যয়ের তীব্র বিরোধিতা করেছে। সেই দ্রোহ সত্যের জন্য— প্রত্যক্ষ ও যুক্তির বোধে দীপ্ত, আত্মপ্রাণিত।

সৌরকেন্দ্রিক বিজ্ঞানবোধ, বাইবেল ভাষিত জিও-সেন্ট্রিক ধর্ম চেতনাকে অস্বীকার করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র গ্যালিলিও-কোপার -নিকাসের প্রত্যয় কেমন করে পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় হয়েছে তার প্রমাণ পেশ করেছেন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ''বিজ্ঞানের প্রবাহে সর্বত্রই ধর্মপুস্তক সকল ভাসিয়া যাইতেছে।'' (ঐ)। এর কারণ দুটি, এক, জগৎসৃষ্টির উৎসে পৃথিবী যে নেই, তার উৎস যে সূর্যের মতো কোনও জ্যোতিষ্ক লোকে— এই বিশ্বাস বিজ্ঞান চেতনার দ্বারা সঞ্চারিত হয়েছে। দুই, সসীম জগৎ নয়, অসীম অনন্ত এক ব্যাখ্যাতীত সৃজন প্রবাহ, অপার রহস্যলোক ক্রমেই মানুষের সামনে প্রতিভাত হচ্ছে। অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন পাশ্চাত্য ধর্ম আর মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না। বিষয়টি অবশ্য একটি প্রবণতা। ক্রমেই পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়েছে। বঙ্কিম দেখাচ্ছেন, আমরাও 'আমাদিগের ধর্মপুস্তকের কথার প্রতি' বিশ্বাস রাখতে পারছি না— 'হতশ্রদ্ধ' হচ্ছি আমরা। ধর্ম আর বিজ্ঞানের এই প্রতিমুখ অবস্থান তাঁর চিন্তন বিশ্বকে গভীরভাবে চঞ্চল করেছে।

ভারতীয় দর্শন বিজ্ঞানের মতো খণ্ড প্রতীকিকে প্রাধান্য দেয় না। তার লক্ষ্য এক পূর্ণায়ত (হোলিস্টিক) তত্ত্ব বিশ্ব রচনা। বিষয়টি নিয়ে ফরাসী পণ্ডিত লেভি স্ত্রোস ভেবেছেন। তাঁর ভাবনাটির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনা চলে না। বঙ্কিম ভেবেছেন অনেক আগে। অন্তত দেড়শ বছর আগে। ক্লদ লেভিস্ত্রোসের ভাবব্যাখ্যান আরও পরবর্তী সময়ের। বিজ্ঞানের অগ্রগতি তখন বহুগুণিত হয়েছে। গ্যালিলিও-র সৌরকেন্দ্রিক চিন্তন বিশ্ব অস্বীকৃত হয়ে নিউটনের অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ শক্তির ব্যাখ্যানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকৃত হয়েছে। বিজ্ঞান রহস্য পড়লে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র এই বিজ্ঞান ব্যাখ্যানের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচিত হননি। তাঁর একটি ভাবনা ছিল এইরকম ''গতিশূন্য নক্ষত্র মাত্রই সূর্য্য। জগতে কোটি কোটি সূর্য্য'' (পাদটীকা -১; বিজ্ঞানরহস্য; 'বঙ্কিম রচনাবলী'; দ্বিতীয় খণ্ড; সাহিত্য সংসদ; পঞ্চম মুদ্রণ, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ, ১৪৫ পৃঃ)। বোঝা যায়, মহাজাগতিক চলন, ছায়াপথ, সুপার্নোভা, ব্ল্যাক হোল প্রভৃতি প্রত্যয় ও বিবেচনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তখনও পরিচিত হননি। ক্লদ লেভিস্ত্রোস বিজ্ঞানের বহু পরবর্তী অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত। তাঁর কর্মক্ষেত্রেও বিজ্ঞান

গবেষণার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ও প্রদেশগুলির কাছাকাছি। তবু লেভি স্ট্রোস দেখেছেন বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা।

ক্লদ লেভি স্ট্রোস দেখেছেন বিজ্ঞানের প্রধান ত্রুটি— বিবেচনার অপূর্ণতা, খণ্ডতেই তার লক্ষ্য বিবেচনার ক্ষেত্র যেন সন্তুষ্ট। ফলে আজ বিজ্ঞান যা ভাবে, ভবিষ্যতে তাই ভাববে তার কোনও স্থিরতা নেই— খুব সম্ভব আজকের সত্যকে অস্বীকার করেই ভবিষ্যতের বিজ্ঞান পথ রচনা করবে। টলেমি-পিথাগোরাসের জ্যামিতি যেভাবে পরবর্তী বিশ্ববিচারের দ্বারা অস্বীকৃত হয়েছে, গ্যালিলিও-র ভাববিশ্ব যেভাবে নিউটনের দ্বারা, নিউটন যেভাবে আইনস্টাইনের দ্বারা, আইনস্টাইন যেভাবে সম্প্রতি কালের হিগস-পার্টিকল তথা ঈশ্বর কণার পরীক্ষার দ্বারা অস্বীকৃত হয়েছে— তেমনি করে এই জ্ঞান কাণ্ডের যাত্রা। পূর্ব প্রতীতিকে ধ্বংস করতে করতে পরবর্তী প্রতীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে করতে তার যাত্রা। একে জ্ঞান কাণ্ডের বিচারে লেভি স্ট্রোস যথার্থ বলে মনে করেন না। তাঁর ভাবনা, জ্ঞান শৃঙ্খলার পূর্ণতর এক প্রস্তাবের প্রতি আক্ষিপ্ত।

লেভি স্ট্রোস-এর প্রস্তাব, তিনি বরং দর্শনকেই অনেক বেশি সার্থক জ্ঞান শৃঙ্খলা বলে বিবেচনা করেন। দর্শন যা ব্যাখ্যা করে তা পূর্ণ এক জ্ঞান শৃঙ্খলা। সত্যের পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাস। সেই অস্তিত্বকে উপলব্ধির প্রয়াস তাঁর। ভারতীয় দর্শন বিশেষভাবেই এইভাবে বিকাশ লাভ করেছে। ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে আমাদের অধ্যাত্ম চেতনার সম্পর্ক সুবিদিত।

প্রাচীন ভারতে দর্শনের দুটি মাত্রা— (১) আস্তিক্য দর্শন। (২) নাস্তিক্য তথা লোকায়ত দর্শন। আস্তিক্য দর্শন শেষ পর্যন্ত ধ্যান উপলব্ধিকে আর নাস্তিক্য দর্শন শেষপর্যন্ত কাম্য শীল বা আচরণকে প্রাধান্য দিয়েছে। তবে দুই পথেই এক পূর্ণ সত্যের আভাস তাদের চেতনায় ধরা পড়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞানকে এইভাবে ব্যাখ্যার পক্ষপাতী। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যখন যেটুকু জেনেছে, তখন তাকে বস্তুবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, প্রযুক্তি কাঠামোতে প্রয়োগ করেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রধান শক্তি এই নিত্য পরীক্ষা ও প্রয়োগের দৃষ্টান্তে। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিজ্ঞান রহস্যে'র ভূমিকায় লিখেছেন, 'বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল' সকলের জানা দরকার। কারণ, এর দ্বারা ব্যবহারিক জীবনে উন্নতি বিধান সম্ভব। বিজ্ঞান দর্শন নিয়ে যখন তিনি মনোনিবেশ করেছেন, তখন তাঁর স্পষ্ট অভিমত ক্লদ লেভি স্ট্রোসের মতোই। তাঁর ভাষা স্মরণ করছি; 'বিজ্ঞানের অদ্যাপি এমত শক্তি নাই যে, জগৎ অনাদি, কি সাদি, তাহার মীমাংসা করেন। কোনও কালে সে মীমাংসা হইবে কি না, তাহাও সন্দেহের স্থল।' ('কতকাল মনুষ্য?' : উক্ত)।

উক্ত বিজ্ঞান দর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ক্ষেত্রে বহুভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'রজনী'-র একাংশে সন্ন্যাসীর সঙ্গে শচীন্দ্রের কথোপকথন মনে পড়তে পারে। শচীন্দ্র নব্য বিলাতি শিক্ষায় শিক্ষিত। সন্ন্যাসী হিন্দুস্থানী, 'চৌদ্দ আনা নিভাঁজ সংস্কৃত', 'এক আনা হিন্দি' আর 'এক আনা বাঙ্গালা'-য় কথা বলেন। ইনি ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতিনিধি— দর্শন ও অধ্যাত্ম চেতনার মূর্ত বিগ্রহ। শচীন্দ্র তাঁর কীর্তিকলাপে দেখেছে ভণ্ডামি। 'ঔষধ' বিলানো, 'নল' চালানো— চোর ধরা, হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলা— প্রভৃতি বহু 'ভন্ডামি' তাঁর। নব্য শিক্ষিত শচীন্দ্র তাতে বিশ্বাস রাখতে পারেনি। সন্ন্যাসীর কথা ; 'তোমরা মনে কর যে, যাহা ইংরেজরা জানে, তাহাই সত্য, যাহা ইংরেজ জানে না, তাহা অসত্য, তাহা মনুষ্য জ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত। কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিছু অন্যে জানে, কিন্তু কেহই বলিতে পারে না যে, আমি সব জানি— আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না। কিছু ইংরেজ জানে, কিছু আমাদের পূর্ব পুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজরা যাহা জানে, ঋষিরা তাহা জানিতেন না। ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজরা এ পর্যন্ত তাহা জানিতে পারে নাই। সেই সকল আর্য্য বিদ্যা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে।' ('রজনী'; তৃতীয় খন্ড; ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)। উদ্ধৃতি সামান্য বড় হল। বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞান দর্শন এখানে স্পষ্ট। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসেও এরকম অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন সন্ন্যাসীকে দেখিয়েছেন বঙ্কিম। তিনি শৈবলিনীকে ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগে সত্য ভাষণ করিয়েছেন। রজনী-তেও সন্ন্যাসী শচীন্দ্রের স্বপ্নে দেখিয়েছেন রজনীকে— শেষে রজনীর চোখ ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি। এসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান সেই রহস্য আছে। ভারতীয় বিজ্ঞান দীর্ঘদিনের গুরুপরম্পরায়, মুসলমান শাসনের চাপে ইংরেজ শাসনের উপেক্ষায় ক্রমেই আত্মলোপ ঘটিয়ে এক রহস্যের আবরণ গড়ে নিয়েছে। এই রহস্যবিদ্যাকে খুঁজে বিজ্ঞানের সত্য নিষ্কাষণের কাজ তাঁর সময় পর্যন্ত কেউ করেননি। তবে সম্ভাবনাটি বঙ্কিমচন্দ্র সঠিক ভাবেই সনাক্ত করে গেছেন। অচিরেই ভারতবর্ষে এক দল গবেষককে আমরা পেলাম। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের মতো যাঁরা ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্রকে পূর্ণ গৌরবে আবিষ্কার করলেন। আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্র, ভেষজ প্রয়োগ— আয়ুর্বেদ ক্রমেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সসম্ভ্রম স্বীকৃতি পেল। এই বিশেষ জাতীয় আকাঙ্ক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ও সমালোচনা কর্মে আমরা লক্ষ্য করেছি।

(লেখক— উপাচার্য, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)

শ্রীগুরুজী নির্ধারিত 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ' এবং পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিকরা

এস গুরুমূর্তি

সংস্কৃতি, চিরায়ত প্রথা ও উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে হিন্দু জাতিকে চিহ্নিত করার মাপকাঠিতে শ্রীগুরুজী (এম এস গোলওয়ালকর) পাশ্চাত্য সমাজবিদদের অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরা উল্লেখিত তিনটি বিষয়কে জাতীয়তাবাদ নিরূপণের মাপকাঠি হিসেবে বুঝতে গুরুজীর জীবদ্দশা তো বটেই, তাঁর মৃত্যুর পরেও বহু বছর কাটিয়ে দেয়।

একই পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কারের জারক রসে যে ভ্রাতৃত্ব চেতনার (ফ্রেটার্নাল কনসাসনেস) জন্ম হয়, শ্রীগুরুজীই প্রথম তাকে জাতীয়তাবাদ হিসেবে আখ্যা দেন। (বাঞ্চ অফ থটস্, পৃঃ ১৭৫)। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ' কখনোই রাজনৈতিক মতবাদ (ঐ, পাতা ৪০/৫৩১) নয়, কোনও সঙ্কীর্ণ

ধর্মীয় ধারণা তো নয়ই (ঐ, পাতা ১৩৭)। তিনি বলেছিলেন, হিন্দু দর্শন দু'হাত তুলে সমস্ত ধর্মাবলম্বীকে অভ্যর্থনা করে এসেছে (ঐ, পাতা ৪২১), সঙ্গে সঙ্গে অসহিষ্ণুতাকে বর্জন করে সকল বিশ্বাসকেই সমমর্যাদায় গণ্য করেছে (ঐ, ১৮৬)। হায়! একেশ্বরবাদীদের আগমনের আগে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ধারণাটাই ভারতবাসীর অজানা ছিল (সেমিটিক মনোথিসইজম্ দি রুট অফ ইনটলারেন্স ইন ইন্ডিয়া, নিউ পার্সপেকটিভ কোয়াটার্লি স্প্রিং, ১৯৯৪, ইউ এস এ)।

শ্রীগুরুজী বারংবার হিন্দু জীবনযাত্রা, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে দৃশ্যমান বহুত্ববাদীতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিয়ে তাকে একই প্রবাহের ধারা বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কথায়, এই প্রবাহ-মূলে আপাত বৈচিত্র্যকে স্বীকার করেই এক সহজাত একতাকে ধরে রেখেছে (ঐ, ৭৩)। জাতি ও জাতীয়তাবাদ বিষয়ে শ্রীগুরুজীর মৌলিক চিন্তা সূত্রের অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে 'হিন্দু জাতি ও তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের' পার্থক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যা পথপ্রদর্শক। তিনি হিন্দু জাতির পরিচয় রাজনৈতিক সংজ্ঞা থেকে বিচ্ছিন্ন করে 'সাংস্কৃতিক ধারার' শর্তে নির্ধারিত করে গেছেন (ঐ, ৪৫)। পাশ্চাত্য-সমাজতাত্ত্বিক ও পণ্ডিতেরা সেদেশে জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে যে চরম রাজনৈতিক; অনেক সময় ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আমদানি করেছেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীগুরুজীর সুদূর অতীতে বর্ণিত ''জাতি ও রাষ্ট্র যে সবসময় একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ হবে এমন ধারণা ঠিক নাও হতে পারে'' এই অবলোকনের অভ্রান্ত অভিঘাতটি সেভাবে অনুধাবনই করতে পারেননি। কিন্তু একান্ত পরিতাপের বিষয়, পাশ্চাত্য বিদ্বত মহলের ধামাধরা হওয়ার কারণে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীকুল ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি অতীতে তো বটেই, আজও যথানিয়মে শ্রীগুরুজী অনুসৃত সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ধারণাটির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে চলেছেন। শ্রীগুরুজীর যুগল মৌলিক চিন্তা— 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ' ও 'জাতি-রাষ্ট্রের' প্রভেদের তত্ত্ব আজ পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের মূল স্রোতের বিতর্কে ঢুকে আলোড়ন ফেলেছে। সেটিই দেখা যাক।

প্রাচীন জাতিসমূহ ও আধুনিক জাতীয়তাবাদ — জাতির উদ্ভব জাতীয়তাবাদ ধারণার অনেক পূর্ববর্তী

আজকের পাশ্চাত্যের আলাপ আলোচনায় যদি কোনও একটা বিষয়ে তারা সহজেই মতৈক্যে পৌঁছতে পারে, তা হলো 'জাতীয়তাবাদের' ধারণাটা বেশ আধুনিক (ন্যাশানালিজম্— এ ডি স্মিথ, ২০১০)। সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে জাতীয়তাবাদের ধারণাটির কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। উনবিংশ শতাব্দীর কোনও সময়ই এ বিষয়ে বিশেষ চর্চা হয়নি। ১৮৩৬ সালে ইংরেজিতে জাতীয়তাবাদ বলতে বোঝাত 'ধর্মীয় ব্যাপার-স্যাপার' (ঐ)। বিংশ শতাব্দীতেই এই জাতীয়তাবাদ বিষয়টি এখন যে ধারণার ভিত্তিতে চর্চিত হচ্ছে তার উদ্ভব হয় (ঐ)।

জাতির উৎপত্তি ও জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তার প্রভেদ— এই বিষয়ে পাশ্চাত্যে এখন দুটি দৃষ্টিভঙ্গী খুব চালু রয়েছে। — (১) মর্ডানিস্ট বা আধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং (২) ট্র্যাডিশনালিস্ট বা ঐতিহ্যপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী। আধুনিকতাবাদীরা বলছেন জাতি উদ্দেশ্য নিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে, আর জাতি তৈরি হওয়ার অনেক আগেই জাতীয়তাবাদের জন্ম। অন্যদিকে ঐতিহ্যপন্থীদের মত অনুযায়ী জাতীয়তাবাদ নবীন তো বটেই, কিন্তু জাতি একটি জৈবিক প্রক্রিয়ার অংশ। সম্প্রদায়গত, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগতভাবে পরিচিত জনগোষ্ঠীগুলির পরম্পরাগতভাবে ইতিহাসে টিকে থাকা প্রবাহই জাতিসত্তার চিহ্নিতকরণের বৈশিষ্ট্য। (পলিটিক্যাল থিয়োরি— জে হফট্‌ম্যান ও পি গ্রাহাম, পৃ- ২৬৭)।

তাহলে, আধুনিতাকবাদীদের মত অনুযায়ী জাতি সৃষ্টি হওয়ার আগেই জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহ্যপন্থীদের মত অনুযায়ী জাতির জন্ম আধুনিক জাতীয়তাবাদী ধারণা সৃষ্টি হওয়ার অনেক আগে। এই দ্বিতীয় মতবাদটিরই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষ যা ভারত নামে বহু শতাব্দী ধরেই বিরাজিত।

জাতি ও ভারত

জাতি কথাটির রূপ কল্পনা বা ধারণা ভারতে সূচিত হয়েছিল সেই বেদ-পুরাণের যুগে (১৫০০ বি সি)। এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীগুরুজী বললেন, (হিন্দু) জাতি বা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্মরণাতীতকাল থেকেই (বাঞ্চ অফ থটস্, পৃঃ ১২৯)। তিনি এই সূত্রে প্রাচীন ভারতীয় আকর গ্রন্থগুলির কথাই বলতে চেয়েছিলেন যাদের প্রাচীনত্ব প্রশ্নাতীত। দি হিস্ট্রি অফ ধর্মরাষ্ট্র (ভল্যুম-৩, পৃঃ ১৩২, ৬, ভান্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট, পুণা) অনুযায়ী, ''রাষ্ট্র কথাটি ঋকবেদেও উল্লেখিত হয়েছে।'' এখানে রাষ্ট্রসমূহের প্রভু হিসাবে দেবতা 'বরুণে'র প্রশস্তিও গাওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রকে শক্তি ও উৎসাহ যোগাতে অথর্ব বেদে মা বসুমতীর কাছ প্রার্থনা করা হয়েছে (ঐ)। পৌরাণিক ভূগোল অনুযায়ী সাতটি দ্বীপ-এর অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে। এগুলি হলো জম্মু, পালক্ষা, শাল্মলী, কুশা, ক্রৌঞ্চ, শকা ও পুষ্কর (বিষ্ণু পুরাণ)। এই সাতটি অঞ্চল আবার বিভিন্ন 'বর্ষ'-এ বিভক্ত। জম্বুদ্বীপের ৯টি বর্ষ আছে, যার প্রথমটি ভারতবর্ষ। বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও অন্যান্য পুরাণে ভারতবর্ষকে 'এ ল্যান্ড অফ অ্যাকশন' বা কর্মভূমি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি হয়ত এক প্রকারের দেশাত্মবোধসূচক হতে পারে। তবে পাশ্চাত্যে আমরা যে ধরনের জিনিস দেখি, এটি তা নয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই পাণিনির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ভারতবর্ষের মধ্যেই আত্মস্থ হয়ে আছে আরও বহু দেশ। সেই লুপ্ত দেশগুলি, তাদের জনজাতি ও সমস্ত অধিবাসীবৃন্দই ছিল একই রকমের (ঐ, ১৩৪)।

একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ যাকে

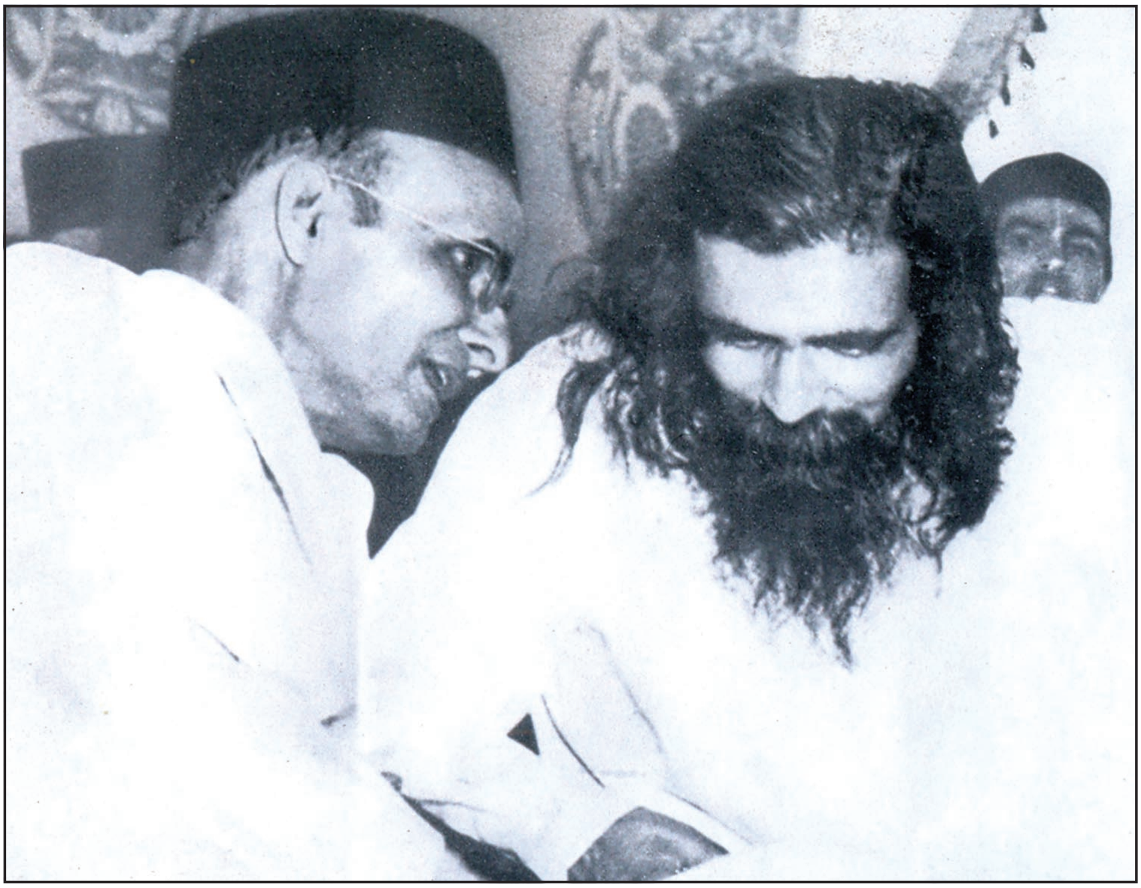

সাভারকর ও শ্রীগুরুজী

আধুনিক পণ্ডিতেরা নারদ পুরাণেরও আগের (৭-১০ ই সি) প্রাচীনতম পুরাণ বলে আখ্যা দিয়েছেন; সেখানে পৃথিবী তথা ভারতের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বর্ণনা ও স্থান নির্দেশ আছে (ভার্স -৪-এর পর— চ্যাপ্টার ১৬)। এই সংস্করণেরই ১৪ নং পরিচ্ছদে মহাদেশ ও উপমহাদেশগুলির বর্ণনা রয়েছে। ১৬ নং পরিচ্ছদে ভারতের বিশদ ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করে বলা হয়েছে, 'ইট ইজ এ মিস্টিরিয়াস সাবকন্টিনেন্ট', যা পৃথিবীর মাঝখানে অবস্থান করছে। যেখানে 'দি ফ্রুটস্ অফ কর্ম আর এনজয়েড'— অর্থাৎ কর্মফল ভোগ করতেই হয় তা শুভই হোক বা অশুভ। গ্রন্থটিতে ভারতের অবস্থানকে আরও প্রাঞ্জল করতে বলা হয়েছে, ''এটি মহাসাগরের উত্তরে এবং হিমভাগের অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত। এই দেশটির নাম 'ভারত' এবং এখানকার অধিবাসীরা 'ভারতী' নামে পরিচিত (বিলংগিং টু ভারত)। সংস্কৃতির ভিত্তিতে এর চেয়ে অভ্রান্তভাবে কি আর কোনও জাতিকে চিহ্নিত করা সম্ভব? এই অবস্থান থেকেই পৌরাণিকরা বলেছেন, ''স্বর্গ ও মুক্তি অর্জন করা যায়।" বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাওই পবিত্র ক্রিয়া কর্মে মানুষকে নিজেদেরই অংশগ্রহণ করে আত্মশুদ্ধি করার নির্দিষ্ট আদেশ দেওয়া নেই। উল্লেখিত গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলীর মতে, এই বিশেষ ধরনের গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় ভারতকে কর্মভূমি নামে অভিহিত করা হয়েছে (ঐ, পাতা ১৫০)। এই আলোচনা থেকে এটি পরিষ্কার, ভারতই সর্বপ্রথম পরিচিত এবং পরম্পরাগত ভাবে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এক জাতি, যারা তাদের সংস্কৃতির মাধ্যমেই বিশ্বের কাছে পরিচিত। সংস্কৃতির ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদের আগে জাতির যে পরিচয়ের অস্তিত্ব আজকের ঐতিহ্যপন্থী পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ববিদরা সদ্য প্রচার করছেন, তার সঙ্গে হুবহু খাপ খেয়ে যায়। ভারত নামের এই সুপ্রাচীন জাতি বৈদিক যুগ থেকে তার অস্তিত্ব বেগবান রেখে, আজ থেকে দু শতাব্দী আগেই বিংশ শতাব্দীর প্রচারিত জাতীয়তাবাদের আগে জাতির ধারণাকে একান্তই পুরনো করে দিয়েছে।

পাশ্চাত্য ঐতিহ্যপন্থীরা শ্রীগুরুজীর (হিন্দু) জাতীয়তাবাদের আদি ধারণাকে এবার নকলই করে ফেলেছে

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আধুনিকতাবাদীরা ঐতিহ্যবাদীদের থেকে আলাদা হচ্ছে কি কি কারণে? প্রথম মতটি ঐতিহ্যপন্থীদের, দ্বিতীয়টি আধুনিকতাবাদীদের প্রথমদের মতে, জাতি একটি সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়, দ্বিতীয়রা বলছেন, এটি একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়।

(২) জাতির ইতিহাস নির্দিষ্ট কালগণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়/

জাতির ইতিহাস একান্তই সাম্প্রতিক ও নতুন আবিষ্কার।

(৩) একটি জাতির পরিচয় দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে আছে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বাসভূমির ওপর / এই ভৌগোলিক সীমা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করা হয়েছে।

(৪) জাতির পরিচয় নির্মাণ একটি জৈব ক্রিয়ার ফল / জাতির পরিচয় শুধুই যান্ত্রিক।

(৫) জাতি হিসেবে পরিচিত হতে গেলে নির্দিষ্ট কিছু গুণ থাকা দরকার, অর্থাৎ মূল্যবোধ / কিছু সম্পদের অধিকারী হতে পারলেই জাতি পরিচয় প্রতিষ্ঠা করা যায়।

(৬) বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে ধরে রাখাই জাতির চরিত্র লক্ষ্মণ / না না এটা বরাবরই পৃথক, খণ্ডিত।

(৭) জাতির পরিচয় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত / এ পরিচয় কেবল সংযোগ ভিত্তিক।

লক্ষ্য করার বিষয়, আধুনিকতাবাদী আর ঐতিহ্যবাদীদের এই বিতর্ক কিন্তু শুরু হয়েছে শ্রীগুরুজীর এই সংক্রান্ত মৌলিক চিন্তা প্রকাশ হওয়ার অনেক পরে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, আধুনিকতাবাদীদের জাতি ও জাতীয়তাবাদের তত্ত্বগুলি একবারে সাম্প্রতিক, আবিষ্কৃত এবং নির্মিতও বটে। (Gellner - 1983, Hobsbawna & Ranger 1983, Anderss on 1983) অন্যদিকে ঐতিহ্যবাদীদের জাতির চিরস্থায়ী অস্তিত্বকে স্বীকার করে গৃহীত তত্ত্বগুলি (Van den Bergne 1978, Geertz 1973, Armsrong 1982) ১৯৭৩ সালের পর থেকেই নাড়াচাড়া হচ্ছে। আশ্চর্যের কথা ঐতিহ্যবাদীদের প্রচলিত মতগুলি গুরুজীর প্রয়াণের বহু বছর পরে প্রচারিত হলেও তা গুরুজীর কল্পনায়— (১) 'হিন্দু জাতির পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক জাতীয়তা' তত্ত্বের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। (বাঞ্চ অফ থটস্, পৃঃ ১৬৪) শুধু তাই নয়, (২) এই জাতি যে স্মরণাতীত কাল থেকে আবশ্যিকভাবে একটি নির্দিষ্ট বাসভূমিতেই বসবাস করে, তারা একটি মূল্যবোধে আস্থাবান থেকে আপাত নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে একতাবদ্ধ অবস্থানে দৃঢ় থেকে এক বংশগত উত্তরাধিকারের ধারাকেই বহন করে চলেছে (ঐ, ৭৩, ১৩৩, ১৬৯, ৪৯৮) এই মতবাদও সম্পূর্ণত শ্রীগুরুজীর বিশ্লেষণেরই পুনরাবৃত্তি। এই সব দেখে পাশ্চাত্য ঐতিহ্যবাদীরা যে শ্রীগুরুজীকে পরতে পরতে নকল করে চলেছেন এই সন্দেহই দৃঢ় হয় নাকি?

এ্যান্টনি ডি স্মিথের সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়-জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব শ্রীগুরুজীর চিন্তনের 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের' কার্বন কপি

১৯৯১ সালে এ্যান্টনি স্মিথের চিন্তাপ্রসূত ও পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত জাতীয়তাবাদের তত্ত্বটি আধুনিকতাবাদী ও ঐতিহ্যবাদীদের মধ্যে থেকে একটি মধ্য পন্থা অবলম্বন করার চেষ্টা করে। তুলনামূলকভাবে এই নবীন তাত্ত্বিকদের অভিমত আধুনিকতাবাদীদের পূর্ববর্তী 'যৌথ সাংস্কৃতিক পরিচিতি'র শ্রীগুরুজী প্রবর্তিত ধারণাটির ওপরই নতুনভাবে আলোকপাত করে। স্মিথ (টীকা চিহ্নিত গ্রন্থ*) জাতির উৎস ও জাতীয় পরিচিতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আধুনিকতা-পূর্ব সম্প্রদায়গত যৌথ সাংস্কৃতিক তত্ত্বটিকেই পুনঃপ্রবর্তন করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। স্মিথের মত অনুযায়ী যৌথ সাংস্কৃতিক পরিচিতির উৎসে রয়েছে ধারাবাহিকতার (কন্টিনিউটি) আবশ্যিক শর্ত। এই ধারাবাহিকতাই জনগোষ্ঠীর মধ্যে জারিত করে 'একই স্মৃতি ও ইতিহাসের' (শেয়ারর্ড মেমোরাইস) সাক্ষী থাকার ও ভবিষ্যতের যৌথ নিয়তিরও (কালেকটিভ ডেসটিনি) শরিক হওয়ার বাধ্যবাধকতার। স্মিথ তাঁর গবেষণায় আরও বলেছেন, বর্ণনার উর্ধ সুদুর অতীতের কোনও একই রকম স্মৃতিতে সমৃদ্ধ কোনও সম্প্রদায় যুগ-যুগান্তের পরিবর্তন ঘটে গেলেও কোনও না কোনও ভাবে নিজেদের মধ্যে সনাক্ত করার মতো কোনও সাযুজ্য রেখে যায়। যাতে ঠিকই বলা যায় এরাই সেই হারানো সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারী (Guibernan, পাতা ১২৬)। শ্রীগুরুজীর মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরে স্মিথের এই তথাকথিত তাত্ত্বিক সূত্রগুলির বিশ্লেষণ করলে শুধু এইটুকুই বেরিয়ে আসে যা বহুকাল আগে গুরুজী চিহ্নিত করে গেছেন। এই বাগাড়ম্বর তারই পুরোপুরি নকল। স্মিথের বিপুল তাত্ত্বিক আলোচনার যে আবশ্যিক শর্ত জাতি সত্তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে উঠে এসেছে সেগুলি হলো—

(১) যৌথ সাংস্কৃতিক পরিচয় থাকা (Collective Cultrual Identity)।

(২) ধারাবাহিকতার বা চলমানতার অনুভূতি (Continuity)।

(৩) একই অতীত ইতিহাসের অংশীদার হওয়া (Shared Memories)।

(৪) যৌথ জাতীয় ভবিষ্যতের অংশীদার হওয়া (National Destiny)।

(৫) জাতির সংজ্ঞায় রাষ্ট্রের সঙ্গে যে প্রভেদ।

এগুলির সবই শ্রীগুরুজী বহুকাল পূর্বেই তাঁর 'বাঞ্চ অফ থটস্'-এর পাতায় পাতায় বর্ণনা করে গেছেন। অবশ্যই সেগুলির বর্তমান সাহেবী নামগুলির সঙ্গে আপাত কিছু তফাত থাকতেই পারে। চিন্তার স্বকীয়তায় শ্রীগুরুজীই ছিলেন পথিকৃৎ। আজ তাঁর মতামতই পাশ্চাত্য অনুসরণ করছে মাত্র।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় স্মিথের সেন্স অফ কনটিনিউটি -কে শ্রীগুরুজী বলেছেন, কনটিনিউটি বা ধারাবাহিকতা।

(২) স্মিথের শেয়ার্ড মেমোরি গুরুজীর কমন মেমোরি।

(৩) স্মিথের ন্যাশনাল ডেসটিনি গুরুজীর সঙ্গে হুবহু এক।

(৪) স্মিথের জাতির সংজ্ঞায় রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রভেদের ক্ষেত্রে গুরুজী হিন্দু জাতির সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ব্যবধানের তত্ত্ব বহু আগেই বলে গেছেন।

প্রথমেই বর্ণিত যৌথ সাংস্কৃতিক পরিচয় কাল প্রভাবে হারাতে হারাতেও যার কিছু চিরন্তন ভাব টিকে থাকে যাতে তাকে

ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া ও শ্রীগুরুজী।

অতীত পরম্পরায় সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে আজও সনাক্ত করা যায় তার অকাট্য উদাহরণও গুরুজী দিয়ে গেছেন। ইসলামাবলম্বী পাকিস্তানের অতীতের 'টাকা' সম্প্রদায় আজকের তক্ষক সম্প্রদায় যা (পুরাণে উল্লেখিত)। একইভাবে সেখানকার 'পুরু' সম্প্রদায় বৈদিক যুগের 'পুরু' সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার বহন করছে। গুরুজী বলেছেন, ধর্মীয় পরিচয় পাল্টে গেলেও তাদের সম্প্রদায় বা জাতিগত পরিচয় যুগ যুগান্তের প্রবাহের সঙ্গে বহমান রয়েছে। এমন অভ্রান্ত তত্ত্বকে অস্বীকার করার হিম্মত দেখাতে না পেরে পাশ্চাত্য আজ নিছক চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় নিচ্ছে।

* টীকা

A. D. Smith on National & National Identity - Critical Assessment by M. Guibernaw ASN 2004।

(অনুবাদক - সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
সৌজন্যে : অর্গানাইজার)

With Best Compliments From :-

TUHIN MONDAL

General Secretary

BJP, Barasat

North 24 Parganas

With Best Compliments

From :-

A Well Wisher

এলাহাবাদ পূর্ণকুম্ভের জন্য প্রকাশিত হল

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ

— লাল ঠাকুর

—: *প্রাপ্তিস্থান* :—

ঘোষ এন্ড চক্রবর্তী

(পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলারস্)

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতাঃ৭০০ ০৭৩

ফোন - ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮

Kothari Charity Trust

C-4, Gillander House

8, N. S. Road

Kolkata - 700 001

রাষ্ট্রের পুনর্গঠন ও মানবসম্পদ বিকাশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূমিকা

সত্যনারায়ণ মজুমদার

বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সুদীর্ঘকাল একত্রে বসবাস করে নিজেদের মধ্যে এক ভাবগত ঐক্য সাধন করে। ফলে বিশ্বে বিভিন্ন মানব সমাজ তৈরি হয়েছে এবং পরবর্তীকালে তাদের রাষ্ট্রীয়তার বিকাশ সাধিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র আজ পৃথিবীতে গঠিত হয়েছে। প্রত্যেক সমাজ ও রাষ্ট্রের এক বিশেষ জীবন-দৃষ্টি রয়েছে, তদনুযায়ী রয়েছে এক প্রেরণাবিন্দু, যার আধারে সৃষ্টি হয়েছে পৃথক পৃথক প্রেরক তত্ত্ব। এই প্রেরক তত্ত্বানুযায়ী কাজ করার জন্য ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য মনুষ্যের বিকাশের কথা তত্ত্বজ্ঞগণ ভেবেছেন, নচেৎ প্রত্যেক চেতনসত্তার তো এক স্বাভাবিক বিকাশ হয়েই থাকে, ইচ্ছে করলেও এই পরিবর্তন বা বিকাশ স্তব্ধ করা যাবে না। শিশু জন্মানোর পর স্বাভাবিক গতিতেই তার পুষ্টি ও বৃদ্ধি হতে থাকে, যার জন্য বিশেষ কোনও পদ্ধতি গ্রহণের আবশ্যকতা দেখা দেয় না। কিন্তু পরিবর্তন যাতে সঠিক দিকে অগ্রসর হয় সেদিকে লক্ষ্য দান করা দরকার। রাষ্ট্র নির্মাণের সময় প্রত্যেক জাতিই আশ্বস্ত হয়েছে যে, রাষ্ট্র মনুষ্যের কল্যাণ সাধনের জন্য অথবা রাষ্ট্রের স্বরূপ হল কল্যাণকর। সুতরাং নিশ্চিত লোককল্যাণকারী বিকাশকেই সর্বত্র প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন। তবে প্রত্যেকেই স্বীকার করে যে মনুষ্য সুখ লাভ করতে চায়, ফলে মনুষ্য বিকাশের মূল লক্ষ্য হল সুখপ্রাপ্তির কারণে ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের জন্য মনুষ্যকে সহায়ক করে গড়ে তোলা। তাই মনুষ্যকে সম্পদ বলা হয়েছে, যার আমদানি হয়েছে পাশ্চাত্য দেশ থেকে। ভারতে মনুষ্যকে পরমব্রহ্মের অংশ মনে করা হয়। সম্পদের বিকাশ হয় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে, কিন্তু মনুষ্যের বিকাশ হয় সংবেদনের মাধ্যমে, সৃষ্ট চেতনার মাধ্যমে, যাকে শিক্ষা বলা হয়। শিক্ষা অপার্থিব, কেননা চেতনস্তরের বিকাশ অচেতন বস্তুর দ্বারা সম্ভব নয়, সেই কারণে শিক্ষাকে হিন্দু মতে আধ্যাত্মিক বলা হয়।

স্বাধীনতার পর ভারতে শিক্ষামন্ত্রীর পদ ছিল, যা অলঙ্কৃত করেছেন আবুল কালাম আজাদ থেকে প্রতাপচন্দ্র চন্দ পর্যন্ত যশস্বী ব্যক্তিগণ। কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্য ভাবনাতে ভাবিত হয়ে আমাদের দেশও 'মানব সম্পদ উন্নয়ন' মন্ত্রক নাম দিয়েছে শিক্ষা দপ্তরের। মানুষকে সম্পদ রূপে গড়ে তোলা আর শিক্ষিত রূপে গড়ে তোলা

কিন্তু এক বিষয় নয়।

ভারতের প্রেরক তত্ত্ব পাশ্চাত্য দেশ থেকে পৃথক। সুতরাং মনুষ্য বিকাশের পদ্ধতি ও ভাবনাও ভারতের রয়েছে পৃথক। এই তত্ত্ব ও সত্যকে উপলব্ধি না করতে পারলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যা হিন্দুত্বের ভাবনা নিয়ে রাষ্ট্রকে পরমবৈভবশালী করার লক্ষ্যে মনুষ্যের বিকাশ সাধন করে আসছে, তার ভূমিকা অনুধাবন করা একটু কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

ইউরোপের নবজাগরণের পর মানুষের প্রতিভার বিকাশ হোক এবং মানুষ স্বাধীন চিন্তার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করুক— এহেন ভাবনার উদয় হয় এবং বৈজ্ঞানিক যুগের প্রারম্ভ হয়। রেনে দেকার্ত, ফ্রান্সিস বেকন, নিউটন প্রমুখদের ন্যায় বৈজ্ঞানিকগণ অনুপ্রবণ (অটোমাইসড্) এবং যান্ত্রিক বিশ্ব রচনার যে নব বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উদ্ভাবন করেন তার উপরে নির্ভর করেই গত তিনশত বছরের মধ্যে পাশ্চাত্য দেশে কিছু সামাজিক পদ্ধতির বিকাশ সাধিত হয়, যার উপর ভিত্তি করেই মানব সম্পদ বিকাশ অর্থাৎ ব্যক্তিবাদ ও জড়বাদ প্রবল প্রভাবী রূপ ধারণ করে। এহেন জড়বাদী ও ব্যক্তিবাদীগণও সমাজ রচনার মূলভূত সত্ত্বা (Basic Entity) ব্যক্তিকেই গণ্য করেছেন এবং সমাজের জন্য ব্যক্তির বিকাশের প্রয়োজন কেন সে বিষয়েও বিচার করেছেন। মনুষ্যকে তারা দেহ ও মনের সমষ্টিরূপে বিচার করেছেন, দেহ হল পদার্থ। এই পদার্থের পরিশীলিত রূপ (Super structure) হল মন। সুতরাং শরীরকে সুখ দিলেই মনে সুখ থাকবে, কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন এক পরিকাঠামো সৃষ্টি করা। পরিকাঠামোর উন্নয়নকেই তারা বিকাশ হিসাবে দেখেছেন। মনুষ্য একাকী সুখ লাভ করতে পারে না, সুখ লাভের জন্য যে আত্মবিকাশের প্রয়োজন, তার সহায়ক হিসাবে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির একান্ত দরকার।

সমাজ হিসাবে কোনও মৌলিক একক বা সংস্থা নেই, মৌলিক একক হল ব্যক্তি, সুতরাং অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে বা সহযোগিতায় কিভাবে সে সুখ লাভ করতে পারে তার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক পৃথক বিকাশের আবশ্যক। কেননা অন্যান্য লোকের সহযোগিতা পেতে হলে তাদের সঙ্গে চুক্তির প্রয়োজন, কিভাবে কতটা আদান-প্রদানের মাধ্যমে এই সুবিধা লাভ করা যেতে পারে, এই ভাবনা থেকেই Social Contract Theory সৃষ্টি হয়েছে। এই চুক্তি বা কনট্রাক্ট পূরণের অভিমুখী হবে মনুষ্যের বিকাশ বা প্রশিক্ষণ।

পাশ্চাত্য দর্শন বিশ্বে বিজ্ঞানের তত্ত্বকে ব্যবহার করে যান্ত্রিক বিশ্ব রচনার যে জড়বাদী সমাজবৈজ্ঞানিক প্রণালী সৃষ্টি করে, তার অন্য আর একটি দিক হল যে মানব মন যা মনুষ্য সম্পদের বিকাশের কেন্দ্র, তা দুর্জ্ঞেয় এবং Matter is only material-এহেন সিদ্ধান্তের স্বীকৃতি। এর ফলে বিচার করা হয়েছে যে, মানুষের মনের

শারদীয়ার শুভেচ্ছা—

Vivekananda Real Estate Development Pvt. Ltd.

Regd. Office

Patpur, Aradanga Bankura

M : 9474184092, 9434001537, 03242-251033

R. M. Packers & Logistic

Rajesh Giri
9331043070

Our Services
Office Relocations
Houehold Relocations
Fine Arts Relocations
Car Relocations

PACKING FORWARDING, SHIFTING & MOVEMENT WORLDWIDE

3, Syed Sally Street, Kolkata - 700 073
Phone : 2234-1828, Fax : 3023-1276
E-mail : rjsh_gr@yahoo.co.in
Website : www.rmrelocation.com

We are the first to establish the 3rd of cold storage in cooperative sector.

With Best Compliments From :

Adina Samabay Himghar

Adina, Malda

Biresh Rajbanshi, Manager, 9434322959

Prabir Lahiri, Chairman

With Best Compliments From -

A Well Wisher

পরিবর্তনের জন্য পৃথক পৃথক চেষ্টার কোনও প্রয়োজন নেই। কেননা, সামাজিক পরিস্থিতির কারণেই মানুষের মন গঠিত হয় অথবা তার পরিবর্তন বা বিকাশ সাধিত হয়। জড়বাদী দর্শন মানুষের মনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীগণ ভৌতিক পরিস্থিতির উপর অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। Socio-Economic Foundation-এর উপরই মন নির্ভরশীল। সুতরাং আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তন সাধিত হলে মনুষ্যের বিকাশ তদনুযায়ী নিজে থেকেই ঘটতে থাকবে— মনুষ্য মনের সংস্কারের কোনও প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় বিচার হলো যে, ব্যক্তি স্বাধীনতার অনিয়ন্ত্রণ ও অসীমতার কারণে বাকি লোকের বিকাশ ব্যাহত হয়, ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অধিক সুখ লাভের জন্য শোষণস্পৃহা তীব্র হয়ে ওঠে। ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করে রাজ্য বা সরকারকে মৌলিক একক রূপে গ্রহণ করা দরকার। ব্যক্তির বিকাশের জন্য রাজ্য বা সরকার চিন্তা করবে, এবং রাজ্যের প্রয়োজনানুসারে ব্যক্তির বিকাশ ঘটানো হবে। সমস্ত অধিকার থাকবে রাজ্যের হাতে, ব্যক্তি নির্জীব পুঁজিমাত্র, তার কোনও ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, প্রকৃতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না, কেবলমাত্র রাজ্যের উপযোগী হয়ে ওঠার এক সাধন মাত্র হবে। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে যে সমাজের পরিবর্তন অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার রচনা ও তদনুযায়ী মনুষ্য বিকাশ একমাত্র শাসন ক্ষমতার মাধ্যমেই সম্ভব (Reform through legislation)। এই পদ্ধতিতে শাসন ক্ষমতা সর্বশক্তিমান, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম হলো যে যার দায়িত্ব বেশি তার কর্তৃত্বও বেশি হবে— Responsibility and authority must be corresponding— এহেন ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থা একনায়কতন্ত্রী হলে, সমাজ অত্যাচারিত হলে, সমাজের অভিযোগ করার কোনও নৈতিক ক্ষমতা থাকবে না। শাসনমুখী মানবমন হওয়ার জন্য নৈতিকতার প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাবে। কারণ, শাসন যখন একমাত্র লক্ষ্য তখন শাসনক্ষমতা দখল এবং ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে সমস্ত ন্যায় অন্যায় উপায় স্বীকৃতি লাভ করবে, সুতরাং মনুষ্য বিকাশে নৈতিকতার কোনও স্থান নেই।

হিন্দু বিচারধারাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমকে অতি নগণ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র নির্মাণের এবং মনুষ্য বিকাশের বহু সাধনের মধ্যে এটি অন্যতম একটি সাধন মাত্র, যা সর্বেসর্বা নয়। সমাজ সরকার নিরপেক্ষ হোক এই হল হিন্দু আদর্শ। সর্বসাধারণ নাগরিকের জাতীয় চেতনার বিকাশের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ভারতীয় হিন্দু আদর্শে। ফলে এখানে মনুষ্য বিকাশের অর্থ হলো মনুষ্যের চেতনার বিকাশ অর্থাৎ পশুত্ব থেকে মনুষ্যকে দেবত্বে নিয়ে যাওয়া। এহেন জাতীয় চেতনাসম্পন্ন সমাজ জীবনের বিভিন্ন এককের মাধ্যমে পৃথক পৃথক গণসংগঠন-এর স্বশাসিত গঠন প্রণালীর দ্বারা সমাজের অস্তিত্ব বজায় থাকবে এবং তাদের কার্যকলাপ চলতে থাকবে। এগুলির মাধ্যমে সমাজে এক নিত্যসিদ্ধ জাতীয় লোকশক্তি বিদ্যমান থাকবে। এই কারণে প্রাচীন ভারতে Multi-dimensional power structure গঠিত হয়েছিল, যার ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব সমাজের জন্য সৎকার্য করতে বাধ্য হোত। সচেতন জাতীয় সমাজ attendent factors-এর ন্যায় কাজ করলে রাজনৈতিক ক্ষমতাও নীতিহীন হতে সক্ষম হবে না। সুতরাং মনুষ্য বিকাশের বিষয়ে ভারতে চিন্তা করা হয়েছে যে, মনুষ্যসম্পদ যেন স্বয়ংশাসিত, আত্মনির্ভর, রাজনীতিনিরপেক্ষ, সমাজকেন্দ্রিক ব্যবস্থার উপযোগী হয়ে ওঠে। ফলে শিক্ষা, অর্থ, স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থাগুলিও এখানে রাজনীতিমুখী না হয়ে সমাজমুখী হয়েছে।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার

পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় প্রত্যেক ব্যক্তির বিকাশের কথা বলা হলেও, সেখানে ন্যায় ও সাম্যের সফলতা না আসার কারণ হলো যে, সেখানে ব্যক্তিমনের দুই পরস্পরবিরোধী ইচ্ছার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়নি। অর্থাৎ সমাজের ধারণা ও ব্যক্তি বিকাশের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করার বিষয়ে কিছুই ভাবা হয়নি। উন্নত সমাজের বিষয়ে তাদের ধারণা হল যে, ব্যক্তির মধ্যে সাম্যের ভাবনা থাকা দরকার অর্থাৎ প্রথম ইচ্ছা হলো সমানতা এবং অপর ইচ্ছা হলো ব্যক্তির তদ্রূপ বিকাশ। কিন্তু পাশ্চাত্য মনঃস্থিতিতে এই দুইয়ের সামঞ্জস্য কিভাবে আনা যাবে সে ব্যাপারে চিন্তা করা হয়নি। কারণ, তাদের বিচারের ভিত্তি হলো ভৌতিক, সমস্ত জীবনমূল্যই ভৌতবাদের উপর নির্ভরশীল। ভৌতিক সমৃদ্ধি, লাভ, সুবিধা অর্থাৎ যা কিছুই পার্থিব তা লাভ করার নামই হলো মানব

সম্পদের বিকাশ। কিন্তু এহেন বস্তুর উপার্জনের মাধ্যমে যে অর্থ তা অর্জন করার একটি সীমা রয়েছে এবং according to ability যোগ্যতানুযায়ী প্রত্যেকে এই অর্থ উপার্জন করতে পারবে, যার একটি অনুপাতও রয়েছে। অর্থাৎ যোগ্যতানুযায়ী অর্থ প্রাপ্তির আনুপাতিক হারই হল জাগতিক সাম্য। ফলে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন যখন বুঝবে যে ভৌতিক সম্পদ অর্জনের জন্য যদি বিকাশ হয় এবং শ্রেষ্ঠ বিকাশের ফলস্বরূপ অধিকাধিক অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা যখন নেই, তখন অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন কোথায়? আইনস্টাইন, রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখদের ন্যায় ব্যক্তি হলেও তো যে অর্থ পাওয়া যাচ্ছে, তার থেকে বেশি পাওয়া যাবে না। সুতরাং সর্বোচ্চ বিকাশেরই বা প্রয়োজন কোথায়? অপর দিকে যার যোগ্যতা কম এবং কম পরিশ্রম করে সে যে অর্থ পাচ্ছে আত্মবিকাশের কোনও পরিকল্পনা না করলেও তো সেই অর্থই লাভ করা যাবে, সুতরাং সে আরামে থেকে বিকাশের প্রতি সচেষ্ট হবে না। মনে করা যাক যে অধিক বিকাশযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি হলে এক হাজার টাকা পাবে। অধিক পরিশ্রম করেও এর বেশি অর্থ উপার্জনের কোনও ব্যবস্থা নেই। আবার কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি একশত টাকা উপার্জন করতে পারবে। সুতরাং, প্রশ্ন হলো, অধিক পরিশ্রম করেও যখন হাজারের বেশি অর্থ লাভ হবে না, তখন ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই ভাববে যে আরামে থাকা যাক, কেননা কম পরিশ্রম করলে তো একশ টাকা পাওয়া যাবেই। স্পষ্ট কথা হলো যে, ভৌতিকতাবাদী জীবনমূল্য আধারিত বিকাশের ফলে মনুষ্য সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আত্মবিকাশের প্রেরণা সমাপ্ত হয়ে যাবে।

হিন্দু চিন্তাধারায় ব্যক্তিকে মৌলিক একক হিসাবে মান্য করা হয়নি। সমাজ সম্পর্কে ভারতবর্ষের ধারণা হলো যে সম্পূর্ণ সমাজ এক অবয়ব বিশেষ এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহ এই শরীরের এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায়— ''সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ..''। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রার্থনাতে সেইজন্য বলা হয়, 'বয়ং হিন্দুরাষ্ট্রাঙ্গভূতা..'' অর্থাৎ আমি ও আমার সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ হলো অঙ্গাঙ্গী— ব্যক্তি কোনও বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়— রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত একজন মাত্র। এহেন একাত্মতার ভাবনার জন্য একদিকে যেমন ব্যক্তির নিজের বিকাশ সাধিত হয় এবং অপরদিকে বিকাশের উচ্চতম ও শ্রেষ্ঠতম পরিণতিকে রাষ্ট্রপুরুষের চরণে সমর্পিত করার এক ভাবনা জাগ্রত হয়। ফলে ব্যক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেরও বিকাশ সাধিত হয়। লক্ষ্য দান করা হয় যাতে কোনও ব্যক্তির বিকাশের ক্ষেত্রে অন্য কেউ বাধাস্বরূপ না হয়, একজনের উন্নতি অন্যের যেন পশ্চাৎপদতার কারণ না হয়। এহেন মনোভাব তৈরির জন্য সমাজে সংস্কারদানের ব্যবস্থা ছিল। সংস্কারের তিনটি দিক রয়েছে, যথা (১) 'গুণাবধারণ'— প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সহজাত যে গুণ রয়েছে তার সংরক্ষণ ও সংবর্ধন (২) 'দোষাপনয়ন'— ব্যক্তির মধ্যে যে

Coolfi ICE CREAM

AN ISO 9001-2008 CERTIFIED COMPANY
NATIONAL AWARD WINNER-2008

Arim Icecream Industries (P) Ltd.

225A, N. S. C. Bose Road,
Kolkata - 700 047.

Distributorship / Dealerships solicited
Ph.No. : 2471 3646, 2421 6468
Fax : 2411 5011
E/mail : coolfiicecream@rediffmail.com

জাতীয়তাবাদের আধারে ন'কোটিরও বেশি বনবাসী / গিরিবাসীর সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে কর্মরত অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনায় —

HCS INFOTECH PVT. LTD.

211D/1, Bagmari Road, Kolkata-700054,
(Behind Honey Da
Dhaba of Kankurgachi),

Phone : 033-3095 3537, Mobile : 98314-78952 / 53, 98310-61942.

E-mail : hcsnet@vsnl.com,
info@hcsinfo.com, website :
www.hcsinfo.com

দোষ দেখা যাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিগণ তার সেই দোষ দূর করার জন্য সহায়তা দানে নিযুক্ত থাকবেন এবং (৩) 'হীনাঙ্গপূর্তি'— সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিকাশের ক্ষেত্রে মনুষ্যের মধ্যে যে ন্যূনতা থাকবে তা পূরণ করার ব্যবস্থা— সমাজের এহেন সংস্কার দানের ব্যবস্থা থাকার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার মনের পরিবর্তন সাধনে ক্রমিক অগ্রসর হোত। ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞব্যক্তিগণ প্রতি ব্যক্তিকে একদিকে যেমন সম্পূর্ণ সমাজ বিষয়ে ধারণা দান করেছেন, তেমনি অন্যদিকে প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন, ফলে সমাজের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছে।

এহেন পণ্ডিতব্যক্তিগণ চিন্তা করেছেন যে, প্রত্যেককে আত্মবিকাশের পূর্ণ প্রেরণা ও উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু ব্যক্তির বিকাশের প্রেরণা হিসাবে কেবল ভৌতিক বিষয়কেই গ্রহণ করলে হবে না, অপার্থিব বিষয়কেও স্বীকার করা দরকার। ভৌতিক প্রেরণার তাৎপর্য হলো অর্থ বা ক্ষমতার মাধ্যমে সুখভোগ করা এবং অপার্থিব প্রেরণার মাধ্যম হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করা। বর্তমানে সামাজিক সম্মানের সঙ্গে ভৌতিক সুবিধা একাকার হয়ে গেছে। ফলে সামাজিক ও বিকাশ পদ্ধতিতে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে।

এ দু'টি বিষয়কে পৃথক করে দেখা যাক যে যেখানে সামাজিক প্রতিষ্ঠা রয়েছে, কিন্তু জাগতিক সুবিধা নেই, যেখানে ব্যক্তি বিকাশের জন্য কেন সচেষ্ট হবে? পাশ্চাত্য বিচারে এর কোনও সমাধান নেই। কিন্তু হিন্দু দর্শন ও সমাজ রচনার মধ্যেই নিহিত আছে এই প্রশ্নের উত্তর। আমাদের দেশে চিন্তা করা হয়েছে যে, এই দুটি বিষয় একই সঙ্গে বর্তমান থাকবে— প্রথমতঃ ভৌতিক লাভ— যার মাধ্যমে জাগতিক সুখ লাভ করা যেতে পারে এবং দ্বিতীয়ত, সামাজিক প্রতিষ্ঠা— যেখানে ভৌতিক লাভ বা সুখ নেই, কিন্তু সম্মান রয়েছে— এই দুটি জিনিসই প্রত্যেককে লাভ করতে হবে, কিন্তু একটি বেশি হলে অপরটি কম হবে। সুতরাং মনুষ্যকে বিচার করতে হবে কোনটি সে বেশি পরিমাণে লাভ করতে ইচ্ছুক এবং তার জন্য তাকে আত্মবিকাশের সংস্কার গ্রহণ করতে হবে।

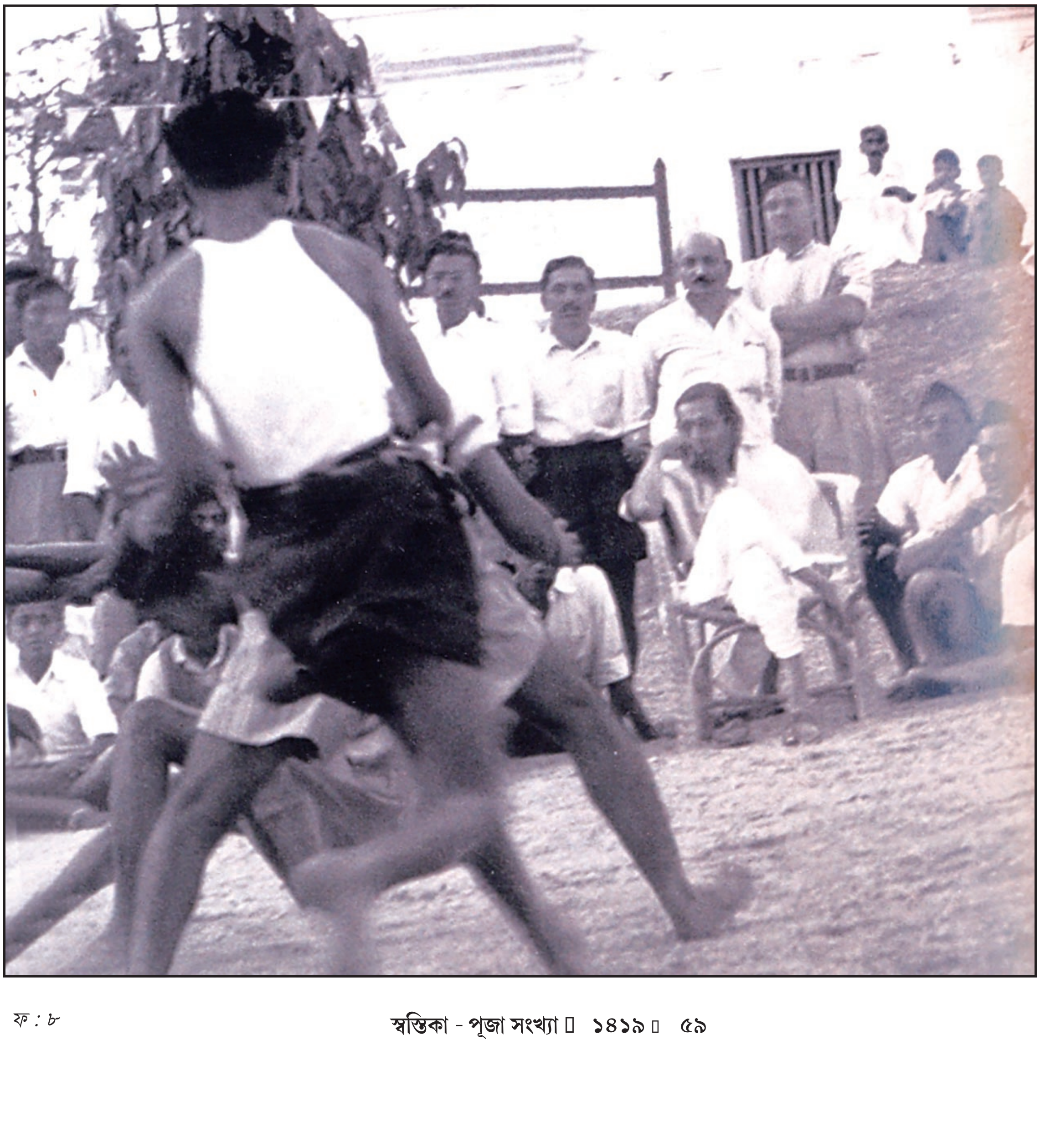

শাখায় কবাডি খেলা দেখছেন শ্রীগুরুজী।

শুভ শারদীয়ার প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন —

NAGARJUNA CONSTRUCTION
COMPANY LIMITED

অপার্থিব সামাজিক সম্মানের প্রতি আমাদের পূর্বপুরুষগণ অধিক গুরুত্ব দান করেছেন। সেইজন্য এখানে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ধনাধিকারী চক্রবর্তী রাজারও প্রণম্য ছিলেন। এবং এঁরাই ছিলেন সমাজের পথপ্রদর্শক, যাঁদের চরণতলে উপবিষ্ট হয়ে সমস্ত সমাজ কর্তব্য-অকর্তব্যের শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং তাঁদেরই নির্দেশে সমাজ পরিচালিত হয়েছে।

বর্তমানে মানবসম্পদ বিকাশের অর্থই হয়ে গেছে যে মানুষ কত বেশি অর্থ উপার্জন বা সম্পদ সংগ্রহ করতে পারবে। যার যত সম্পদ আছে, সে ততই উন্মত্ত ও বিকাশযুক্ত ফলে সমাজে ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। আত্মবিকাশের পথ থেকে ব্যক্তি বিচ্যুৎ হয়ে কেবল অর্থ উপার্জনের দিকে পতঙ্গের ন্যায় ধাবিত হচ্ছে, ফলে প্রতিযোগিতার জন্য সাম্য ও বিনষ্ট হয়েছে। হিন্দু চিন্তাধারায় যে সাম্যের কথা বলা হয়েছে তা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির আশা, আকাঙ্ক্ষা, রুচি, স্বভাব ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন, প্রত্যেকে রুচি অনুযায়ী নিজ পছন্দের বিষয় নির্ধারিণ করবে, কিন্তু যদি ভৌতিক ও অভৌতিক আধারে নিজস্ব বিষয় নির্বাচন করা হয় এবং তদনুযায়ী মনুষ্যের বিকাশ সম্পাদিত হয়, তবে এই দুইয়ের বিভাজনে যেমন সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে, তেমনি ব্যক্তিগত বিকাশের প্রেরণাও অক্ষুণ্ণ থাকবে।

চতুর্দিকে আজ যে ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার কারণ হলো যে এই ধারণা বিকশিত হয়েছে যে, প্রতিযোগিতার কারণেই উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে কোনও বিকাশই প্রতিযোগিতার কারণে হয় না। সহযোগিতার কারণেই সম্ভব। একজনের দুর্বলতা, অক্ষমতা যদি অন্য কোনও সক্ষম ব্যক্তি পূরণ না করে তবে সমাজে স্বাভাবিক বিকাশ স্তব্ধ হয়ে যাবে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ সেই কারণে প্রতিযোগিতা নিজের সঙ্গে করার কথা বলেছেন। কারণ, আত্মসমীক্ষার মাধ্যমেই মানুষ বুঝতে পারে তার দুর্বলতা কোথায় এবং আত্মপ্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেই দুর্বলতা দূর করে সে অধিক গুণযুক্ত হবার চেষ্টা করতে থাকে।

বর্তমানে সামাজিক সম্মান ও ভৌতিক সুখভোগ সমানার্থে প্রযোজ্য হওয়ার জন্যই প্রত্যেকে প্রধান থেকে প্রধানমন্ত্রী হবার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে। ফলে সমাজে হিংসা, বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা, সন্ত্রাস প্রভৃতি ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু ভারতীয় আদর্শের প্রতীক চাণক্যের মতো যদি প্রধানমন্ত্রী হবার শিক্ষা দেওয়া যায় অর্থাৎ সর্বোচ্চ পদাধিকারী হয়েও সন্ন্যাসীর ন্যায় সর্বত্যাগী জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হবে তবে এহেন প্রতিযোগিতা সমাপ্ত করে মানুষ নিজেকে সামাজিক সম্মানের পাত্র হিসাবে গঠন করার জন্য আত্মবিকাশের পথকেই অনুসরণ করবে। ফলে সমাজ নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন হবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সেই কারণে সমাজকে শিক্ষা দেয় যে, রাষ্ট্রের কাজের জন্য কিছুই পাওয়া যাবে না, বরং সব কিছু রাষ্ট্রের চরণে সমর্পণ করতে হবে। এই কাজ সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকগণ আচরণের মাধ্যমে প্রমাণ করে সমাজে বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। হিন্দু বিচারে মানুষকে কেবল ভৌতিক শরীর মনে করা হয়নি। মানুষ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার অংশ, যার মধ্যে রয়েছে মন, বুদ্ধি ও আত্মা। সুতরাং মনুষ্যের বিকাশের অর্থ হল তার শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ— এই কারণে এখানে এই চারটির পরিপুষ্টি, সন্তুষ্টি ও উন্নতি সাধনের জন্য এক ধর্মাধারিত সমাজব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ— এই চারটি পুরুষার্থকে আমরা অখণ্ডরূপে চিন্তা করেছি। ধর্ম হল অর্থ ও কাম উপভোগের আধার এবং মনুষ্য জীবনের অন্তিম লক্ষ্য হলো মোক্ষলাভ। অর্থকে অগ্রাহ্য করা ভারতে হয়নি যাকে 'সর্বপ্রয়োজনসিদ্ধি' বলা হয়েছে। নারদ বলেছেন, ''ধনমূলা ক্রিয়া সর্বা যত্ন তস্য অর্জনে মতঃ।'' কিন্তু ধনার্জন সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'ধর্মেন ধনঃ' অথবা সুপথা রায়ে— নৈতিকতার সাথে ধনর্জিন করতে হবে। কৌটিল্য বলেছেন, 'অর্থস্য মূলত উত্থানম' কিন্তু উত্থান একার নয়, সেই কারণে মহাভারতে দ্রৌপদী বলেছেন— ''সর্বেহি স্বং সমুত্থানম্ উপজীবন্তি জন্তবঃ— অর্থাৎ প্রত্যেককে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়ন বা উত্থান। এই সম্মুত্থানমের জন্য প্রয়োজন সঠিক ধনবন্টন ব্যবস্থা। Distributive Justice হিসাবে পঞ্চমার্গের কথা আমাদের অর্থনীতির পণ্ডিতগণ সমাজে শিক্ষাদান করে তাকে আচরণে আনার ব্যবস্থা করেছেন—

'ধর্মায় যশসেহর্থায় কামায় স্বজনায় চ।
পঞ্চধা বিভজন্বিত্তমিহামুক্ত চ মোদতে।''

অর্থ জীবন পোষণের জন্য হলেও তা জীবন লক্ষ্য হিসাবে কখনই ভারতে গ্রহণ করা হয়নি।

অপরপক্ষে ধর্মের সঙ্গে বিরোধহীন কামকে শ্রীকৃষ্ণ নিজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ইন্দ্রিয়কে আয়ত্তে রেখে মনকে সংযত করে দেহকে পীড়া না দিয়ে কাম উপভোগের শিক্ষা ভারতবর্ষ দান করেছে। কারণ ধর্মাশ্রিত জীবনচর্যা ব্যক্তি বিকাশের মান হিসাবে এখানে গৃহীত হয়েছে। বলা হয়েছে—

'ন জাতু কামঃ কামানং উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভিবর্ধতে।।'

এই সমস্ত দিক বিচার করে হিন্দু সংস্কৃতির পরিভাষাতে সমাপ্ত তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি বলেছেন যে, উপভোগের মাধ্যমে মনুষ্যের সুদৃঢ় পরিপূর্ণ, অমিশ্র, নিরন্তর ও অখণ্ড বিকাশ সম্ভব নয়। এর কারণ হলো যে, বিকাশ যদি সুখভোগের জন্য হয় তবে পশু ও মানুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকবে না। কেননা, 'আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনং চ। সামান্যমেতৎ পশুভির্নরানাম্।।'

কিন্তু মানুষের সংবেদনশীল মন ও যোগ্যাযোগ্য বিবেকমুক্ত বুদ্ধি রয়েছে এবং ব্যক্তি ও সমাজকে ধারণকারী ধর্মের প্রেরণা সর্বদা ক্রিয়াশীল, সুতরাং যদি কোনও সুখ পেতেই হয়, যার কারণে মনুষ্যের বিকাশ প্রয়োজন তবে তার জন্য মন ও বুদ্ধির আধারে তার বৈচিত্র্য, প্রকার, ঘনত্ব ও স্থায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিচার করা দরকার।

একদিকে যেমন মানুষের মন অর্থ ও কামের প্রভাবে প্রভাবিত না হয়, তেমনি অপরদিকে অভাবও মানুষকে যাতে পতিত না করে, মনুষ্যের বিকাশ যেন রুদ্ধ না হয়ে যায়, তার জন্য সমাজে অর্থের প্রভাব ও অভাবের মধ্যে এক সামঞ্জস্য থাকা দরকার— এহেন ভারসাম্যযুক্ত সামাজিক পরিস্থিতির রচনাকে এখানে ধর্মচক্রের প্রবর্তন বলা হয়েছে।

''অভাবো বা প্রভাবো বা যত্র নাস্ত্যর্থকাময়োঃ।
সমাজে স্বাত্মরূপত্বাৎ ধর্মচক্র প্রবর্তনম্।।''

এহেন সমাজ রচনার জন্য ব্যক্তিকে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করে স্বার্থান্বেষী প্রেরণা থেকে বিচ্যুৎ করে তার প্রেরণাকেন্দ্র সমাজকেন্দ্রিক এবং তার conciousness -কে আরও বিকশিত করে প্রেরণাকেন্দ্র সমগ্র মানবজাতির দিকে নিয়ে যেতে হবে। ফলে স্বীকার করতে হবে জীবনমূল্য হিসাবে ত্যাগব্রতকে কারণ ''ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্— তেনত্যক্তেন ভূঞ্জিথা''। এর ফলে মানুষ আত্মকেন্দ্রিকতার উপরে উঠে ধর্মপ্রবণ হবে, সমাজসমর্পিত অর্থাৎ সাক্ষাৎব্রহ্মসমর্পিত হতে সক্ষম হবে। সমাজ হলো অমূর্ত ব্রহ্মের মূর্তরূপ, ব্যক্তিও ব্রহ্মেরই অংশ সুতরাং ব্যক্তি সমাজের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্বকে যখন দর্শন করবে তখনই তার পূর্ণ বিকাশ হয়েছে বলে স্বীকার করা হবে। নিজের প্রতিচ্ছবি অন্যের মধ্যে দেখার চেতনা সৃষ্টি হলেই মনুষ্য অপরের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ অনুভব করতে সক্ষম হয়। ভারতের সনাতন আদর্শ হলো মনুষ্যের চেতনার অখণ্ড বিকাশ হওয়া দরকার, যার ফলে বৈচিত্র্যের মধ্যে সে একতার দর্শন করতে সক্ষম হবে। সৃষ্টিতে বাস্তব বিষয় হল বৈচিত্র্য, কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করলে inner one -ness -কেই লক্ষ্য করা যাবে, কারণ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' সেই কারণে আমাদের পূর্বপুরুষগণ কিছু আধারভূত সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন, যেখানে Diversity রয়েছে কিন্তু একই পরমব্রহ্মের অংশ বলে ইউনিটিও রয়েছে। সুতরাং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের দর্শনই হল বিকাশের মূল লক্ষ্য। একইভাবে গোঁড়ামির জন্য ঈশ্বরকে নিয়ে পৃথিবীতে যে বাদ-বিসংবাদ চলছে তার সমাধান হিসাবে এই complication -এর মধ্যে Relevance কে অন্বেষণ করে বলেছেন— 'একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'— যতমত তত পথ। সুতরাং মনুষ্যকে উপাসনা পদ্ধতি অনেক কিন্তু গন্তব্য স্থান এক--- এই আদর্শের সাক্ষাৎকার করতে হবে, যার জন্য মনুষ্যসম্পদের বিকাশ দরকার। মনুষ্যের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য থিওরি হিসাবে নয় বরং relationship -এর অঙ্গ হিসাবে বিশ্বের মানবতার সঙ্গে একাত্ম হবার শিক্ষা এখানে দেওয়া হয়েছে এবং মনুষ্যের ব্যবহারের মধ্যে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'— প্রতিফলিত হয়েছে। আমেরিকার লোকেদের 'বোন'-'ভাই' রূপে সম্বোধন করার জন্য সেখানকার লোকেরা সানন্দে স্বামী

With Best Compliments from :

TAX-LINK

Phani Bhusan Biswas

Tax-Consultant

5, K. B. Basu Road
Barasat
KOLKATA - 700 124

Dial : 2552-4204

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ—

—নন্দলাল সিংঘানিয়া

বিশিষ্ট আইনজীবী, কলকাতা হাইকোর্ট

বিবেকানন্দকে করতালি দিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন।

এহেন চেতনার বিকাশক্রম অখণ্ডরূপে চলতে থাকাকে 'শিক্ষা' বলা হয়েছে। আত্মকেন্দ্রিক শিশুর চেতনার বিকাশ ধীরে ধীরে হতে থাকে, ফলে সে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই চেতনার বিকাশ এতদূর বিস্তৃত হয় যে 'স্বদেশঃ ভুবনত্রয়মের' অনুভূতি তার মধ্যে সৃষ্টি হয়। যখন ধর্মপ্রবণতার কথা বলা হয় তখন এহেন চেতনার বিকাশকেই বোঝানো হয়। তাই ভারতীয় হিন্দুধর্ম কোনও রিলিজিয়ন নয়। সী. ই. এম জোডের ন্যায় চিন্তাবিদ তাই বলেছেন— "This distinctly Hindu concept i. e. Dharma, do not admit of Summary description" — বিশেষভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে ধর্ম হলো ব্যক্তি ও সমাজকে উন্নত করার এক প্রক্রিয়া মাত্র। সংস্কারের মাধ্যমে মনুষ্য ও সমাজজীবনকে শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছে দেবার এক ব্যবস্থা মাত্র। মনুষ্যের বিকাশ যদি এহেন ধর্মনিষ্ঠ হয় তবে সমাজ ও রাষ্ট্রের একক হিসাবে ব্যক্তি ধর্মাধিষ্ঠিত সমাজ রচনা করতে সক্ষম হবে। ধর্মাধিষ্ঠিত সমাজের অর্থ হলো আমাদের শাশ্বত জীবনমূল্যের ভিত্তিতে বর্তমানের পরিস্থিতি ও প্রয়োজনীয়তানুসারে সমাজ ধারণার জন্য সংস্থাত্মক রচনা সমাজের মধ্যে তৈরি করা। সুতরাং যুগধর্মানুকূল সংস্থা নির্মাণের জন্য ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি-মানুষের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অত্যধিক এবং এই কাজ করার জন্য মনুষ্য সম্পদের বিকাশকে অগ্রাধিকার দান করা একান্ত কর্তব্য, যার জন্য মনুষ্য সম্পদকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, বিকশিত নয়। এহেন যুগানুকূল ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক সমাজবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ভারতে বিকশিত হয়েয়ে, তার জন্য আমাদের ঋষি-মুনিগণ লক্ষ্য হিসাবে বলেছেন— 'আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'— একদিকে ব্যক্তি শাশ্বত সুখের জন্য অর্থাৎ মোক্ষের জন্য নিজের বিকাশ সাধন করবে অর্থাৎ নিজেকে শিক্ষিত করে তুলবে, তেমনি অপরদিকে জগতের কল্যাণ সাধন করতেও সমানভাবে সচেষ্ট থাকবে। কারণ ব্যক্তি ও সমষ্টি একে অপরের পরিপূরক এবং মহামায়ার প্রকাশ মাত্র। এহেন ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি-মানসের বিকাশ ও ধর্মাধিষ্ঠিত সমাজ রচনার বিষয়ে প্রাথমিক গুরুত্ব দিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ তার কার্যপদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়েছে। ভারতের শাশ্বত সনাতন আদর্শকে সামনে রেখে, সঙ্ঘ কাজের সিদ্ধান্ত ও তার ক্রিয়ান্বয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাকে রাষ্ট্রীয় পুনর্নির্মাণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মানব কল্যাণের জন্য একটি মডেল, একটি আদর্শ বিশ্বের সামনে প্রতিষ্ঠিত করাই সঙ্ঘের অভিপ্রায়, যার ফলে এই দেশকে পুনরায় বিশ্বগুরু হিসাবে সকলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। সঙ্ঘের লক্ষ্য হলো 'পরং বৈভবং নেতু মে তৎ স্বরাষ্ট্রম্'— এই শাশ্বত হিন্দু রাষ্ট্রকে পরমসম্পদশালী করে গড়ে তোলা, যার আধার হচ্ছে 'বিজেত্রী চ ন সংহতা'— এক বিজয়শালিনী সংগঠন, যার ফলে 'বিধায়স্য ধর্মস্য সংরক্ষণম্'— ধর্মের সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন সম্ভব হবে। কিন্তু বিজয়শালিনী সংগঠনের ভিত্তি কি? এর উত্তর হল ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতি ও জীবনপদ্ধতির উপর আস্থা আছে এমন হিন্দু সমাজ। সুতরাং হিন্দু সমাজকে চরিত্রবান

কল্যাকুমারী বিবেকানন্দ কেন্দ্রে শ্রীগুরুজী।

ও পূর্ণ বিকশিত করাই হল সঙ্ঘের কাজ। সঙ্ঘের দ্বিতীয় পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী বলেছেন--- ''আমাদের রাষ্ট্রীয় পুনর্নির্মাণের প্রারম্ভ মনুষ্য নির্মাণের মাধ্যমেই হওয়া দরকার। সমস্ত প্রকারের মানবিক বিবাদ, বিসংবাদ, বিভেদ, বৈষম্যকে জয় করার ক্ষমতা ব্যক্তির মধ্যে তৈরি হোক, প্রেম, আত্মসংযম, ত্যাগ, সেবা, চরিত্র প্রভৃতি সমস্ত পরম্পরাগত হিন্দু ব্যক্তিত্বের গুণাবলীর যা পরিচায়ক তার প্রকাশমান প্রতীকরূপে সকলে গঠিত ও বিকশিত হোক— এই হলো আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের জাতীয়তার এহেন তথ্য, এহেন গৌরবময় স্থিতি আমাদের মন থেকে যেন বিস্মৃত না হয়, যার ফলে প্রাচীনকালে যেমন আমাদের মাতৃভূমি জগদ্গুরুর আসনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন তদ্রুপভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা যেন সফল হই। অতীতকালে আমাদের সংস্কৃতিই এহেন পথ দেখিয়েছে।"

সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা নির্মাণ করার জন্য সঙ্ঘ সচেষ্ট। তার জন্যই সমাজ সংগঠন। কিন্তু সঙ্ঘ সংগঠন বলতে কিছু লোকের সমষ্টিকে চিহ্নিত করতে চায়নি। সঙ্ঘ ও সম্পূর্ণ সমাজ সমানার্থে প্রযোজ্য। সঙ্ঘ সমাজের মধ্যে অন্যান্য সংগঠনের ন্যায় একটি সংগঠন নয়, এটি সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের সংগঠন। সেই কারণে প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে সমাজ সম্পর্কে একাত্মতার বোধ সৃষ্টি করে। সমাজের প্রতি ব্যক্তির সমর্পণের মনোভাব তৈরি করার কাজকেই সঙ্ঘ সংগঠনের কাজ হিসাবে গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন মনে করে যে সে স্বাধীন ও পৃথক কোনও সত্তা নয়, সমাজ শরীরের অঙ্গমাত্র। সম্পূর্ণ সমাজের সঙ্গে সে একাত্ম। সমাজের সুখ দুঃখই তার সুখ ও দুঃখ। সমাজের সম্মান, অপমান তার নিজের সম্মান ও অপমান— এই সকল দিক বিচার-বিবেচনা করে মনের মধ্যে সংস্কার অঙ্কিত করার জন্য প্রতিদিন সমাজের সমস্ত ব্যক্তি কোনও এক নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হবে, পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে দেশ ও সমাজ সম্পর্কে অবহিত হবে, সমাজের কল্যাণের জন্য মন তৈরি করবে— এহেন একাত্মতার সংস্কার গ্রহণ করে অনুশাসনবদ্ধ মনুষ্য সমাজ তৈরি করাই হলো সঙ্ঘের লক্ষ্য। দিন প্রতিদিন পূর্বপুরুষদের কৃতিকে স্মরণ করার জন্য ও রাষ্ট্রের জন্য কি কর্তব্য— এই বোধ উৎপাদনের জন্য সঙ্ঘ শাখাতে যেমন শাশ্বত ত্যাগের প্রতীক গৈরিক পতাকা উত্তোলন করা হয়, তেমনি 'বয়ং হিন্দুরাষ্ট্রাঙ্গভূতা'— এই উপলব্ধির জন্য প্রার্থনা করা হয়। সামূহিক কার্যকলাপের মাধ্যমে 'প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'— এই ভাবনা জাগ্রত হয়। সারা সমাজকে নেতৃত্ব দেবার জন্য ব্যক্তিগত গুণাবলীর, শিক্ষার, সামাজিক আচরণ ইত্যাদির যেন বিকাশ হয়, তার প্রতি প্রত্যেক ব্যক্তির লক্ষ্যদানের ও প্রেরণা সৃষ্টির এক সামুহিক কার্যপদ্ধতি ক্রমিক বিকশিত হয়েছে সঙ্ঘের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে। এহেন মন পরিবর্তনের পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনেকেরই না থাকার জন্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার জন্য সঙ্ঘ কাজকে তারা বুঝতে সক্ষম হন না। কেননা, তারা মনে করেন যে অচেতন বাহ্য পরিস্থিতি

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ—

—সুদীপ্ত জানা
ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার,
মহিষাদল, পশ্চিম মেদিনীপুর

সবাই সুখে থাক, সবাই ভালো থাকুক

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ—

—কে সি দাস,
রাণাঘাট, নদীয়া

চেতন মনকে প্রভাবিত করে। বাহ্য পরিস্থিতি যেমন হবে মনও সেইভাবে গঠিত হবে, সুতরাং মনুষ্যের পরিবর্তনের জন্য মনের কোনও ভূমিকা নেই, কেবলমাত্র সমাজের পরিকাঠামো রচনা করা দরকার। সেই কারণে বর্তমানে Infrastructural Development -কেই বিকাশ বলা হয় এবং যেখানে per capita income এবং per capita expenditure সর্বাপেক্ষা বেশি তাকেই বিকশিত দেশ বলা হয়। কিন্তু বাস্তব বিচার করলে দেখা যাবে যে, পরিস্থিতি মনের উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি মন ও পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। সমস্ত পরিস্থিতির ক্রিয়া বিক্রিয়াতে যে পরিণতি ঘটে, সেখানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে মানুষের ইচ্ছাশক্তি যার কারণে পৃথিবীতে আইনস্টাইন, নেপোলিয়ন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের ন্যায় ব্যক্তিগণ সাধারণ গৃহে জন্মগ্রহণ করে কঠিন দুর্বিসহ পরিবেশের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেও জগৎবিখ্যাত হয়েছেন। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই মনুষ্য নর থেকে নারায়ণ হতে সক্ষম হয়, আবার নারায়ণ রাবণ, কংসের ন্যায়ও হতে পারে। সুতরাং ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা বা সংস্কারও সমানভাবে যদি প্রদান করা হয়, তবে মনুষ্য নিজেকে সমাজের সঙ্গে একাত্ম করতে উদ্বুদ্ধ হবে এবং সামাজিক বৈষম্য দূর করে এক নতুন সমাজ গঠন করতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে। যুগানুকূল রচনা এবং আমূল পরিবর্তনের আধার ক্ষমতা, আইন বা বাহ্য পরিস্থিতির পরিবর্তন নয়, বাঞ্ছিত পরিবর্তনের জন্য প্রাথমিকভাবে মানুষের মনের পরিবর্তন প্রয়োজন। সঙ্ঘ হিন্দু দর্শন অনুসারে প্রতিদিন সম্মেলন, সামূহিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সামূহিকতার সংস্কার, সমষ্টিগত কার্যক্রমের মাধ্যমে সমষ্টির সংস্কার প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এহেন মনোবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রতিদিন প্রতি ব্যক্তির হৃদয়ের যে আমূল পরিবর্তনের প্রয়াস চালানো হয় তা অধিক ফলদায়ী ও স্থায়ী পরিণামদানকারী, যা সঙ্ঘ সমাজে প্রমাণ করে দিয়েছে। এহেন ব্যবস্থা এক সময় ভারতে প্রচলিত ছিল, সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তি নিত্য একত্রিত হয়ে সর্বজ্ঞানী সন্ন্যাসীর পাদপ্রান্তে বসে প্রবচন শুনতো এবং সমাজ সম্পর্কে, আমাদের পূর্বপুরুষদের কৃতী বিষয়ে সচেতন হোত। ফলে সমাজ ছিল স্বশাসিত ও স্বনির্ভর, রাজা শাসন ক্ষমতা কোনওদিনই সমাজকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়নি।

সুতরাং আমাদের সমাজজীবন যখন স্বয়ম্ভু, স্বসামর্থ্যে স্বায়ত্ত, স্বয়ংশাসিত ও সুসংগঠিত রূপে গঠিত হবে তখনই এই দেশের চিরন্তনতা রক্ষিত হবে— এই দিক বিচার করে সঙ্ঘ নিত্য প্রতিদিন মনুষ্য হৃদয়কে সংস্কারিত করে সমাজের প্রতি পূর্ণ সমর্পণের মানসিকতা যেমন তৈরি করেছে, তেমনি সমর্পণের আচরণও করতে শিখেছে সমাজ। এহেন একাত্ম্য (সমাজ বিষয়ে) ব্যক্তিদের অনুশাসনবদ্ধ সংগঠন তৈরি করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপন্ন সমস্ত সমস্যার স্বাভাবিক সমাধান করতে সঙ্ঘ বদ্ধপরিকর।

ভৌতিক উন্নতির ধারা সারা বিশ্বের সামাজিক পরিকাঠামোকে বিশৃঙ্খল করে দিয়েছে, ভোগ্যসামগ্রী উৎপাদনের ও উপভোগের জন্য মানুষ লোভী, আত্মকেন্দ্রিক ও অহিতসাধক হয়েছে। ফলে বিশ্ব দূষিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ঘোষণা Peace, sustainable development এবং Protection of enviornment, বাস্তবে তো রূপায়িতই হয়নি, বরং এর পরিবর্তে আজ Global Terrorism,Global Recession, Global Warming সারা বিশ্বকে বিচলিত করে দিয়েছে। সেই কারণে ভারতীয় নৈতিক চরিত্রের বিকাশের কথা আজ সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে।

International Institute of Management Development -এর প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী Prof. Laymon লিখেছেন— "The Global environment is a dispersal of ideas, philosophy and religion. India is a most prolifie birth place of all these due to the great synergy of democracy and diversity. So Indian religions and philosophical traditions can provide the sense of moral organ, spirituality and ethical campass which this world is desperately needs"।

সৃষ্টির মধ্যে underlying oneness আছে, তার শিক্ষা হিন্দু সমাজকে দিয়ে সারা সমাজকে সর্বগ্রাহী ও সহিষ্ণু করে গড়ে তোলার কাজ সঙ্ঘ করছে এবং এহেন মানবসম্পদ বিকাশের পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে যে সমস্ত মনুষ্য সঙ্ঘ তৈরি করেছে এবং তারা নিজস্ব প্রয়াসে সমাজে যে সব জনসংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেছে তার মধ্যে নিঃস্বার্থতা ও কল্যাণকারী ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে ক্রমে ক্রমে জনতার বিশ্বাসও অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। নিঃস্বার্থ, সমাজপ্রেমী মনুষ্যই সমাজের পরিবর্তন এনেছে এবং সমাজ সুখী হয়েছে। সঙ্ঘও এহেন নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন, নিষ্কলুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে একাত্ম মনুষ্য তৈরির কাজ করে চলেছে। কিন্তু মনুষ্য নির্মাণ এবং তার বিকাশ স্বল্পকালীন কাজ নয়, এর জন্য দীর্ঘসময় ও বহুল কার্যকর্তা প্রয়োজন, এই সমস্ত শর্ত পূরণের দিকে সঙ্ঘ সচেষ্ট। যার ফলে ভারতীয় ও অভারতীয় বিদ্বান ব্যক্তিগণ যে সামাজিক পরিবর্তনের কথা alternative, ideological, philosophical Valu System -এর দিকে অগ্রসর হবার কথা বলছে তার সুনিশ্চিত বাস্তব রূপ দিতে সঙ্ঘই কেবলমাত্র সক্ষম হবে। কারণ সঙ্ঘ প্রমাণিত, শাশ্বত, সনাতন বিকাশ পদ্ধতি বা শিক্ষা পদ্ধতিকে অনুসরণ করে মনুষ্য নির্মাণ করছে— এই পদ্ধতি বিকল্পহীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সমাজবিজ্ঞানসম্মত।

(রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তাদের বক্তব্য থেকে গৃহীত সূত্রের মাধ্যমে প্রবন্ধটি রচিত)

Sangam Fashions (P) Ltd.